তোমার জন্য

– এস এম আছাব আলী

এক ফাল্গুনের সকাল। সান্তাহার রেলওয়ে জংশনে তিন নাম্বার প্লাটফরমে সিমেন্টের লম্বা চেয়ারের ওপর বসে পত্রিকা পড়ছিলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই *আন্তঃনগর বরেন্দ্র* ট্রেন আসবে। রাজশাহী যাবো। ছেলেমেয়ে সেখানে লেখাপড়া করে। সেই কারণে আমাকে প্রায়ই রাজশাহী যেতে হয়। পত্রিকা পড়তে পড়তে মনে হলো আমার সামনে কে যেন দাড়িয়ে আছে। চোখ তুলে দেখলাম গলায় চমৎকার ওড়না প্যাচানো একটা মেয়ে দাড়িয়ে।

বললো, আপনার নাম কি... ?

ওড়নার চেয়েও চমৎকার হলো তার গলার স্বর এবং মিষ্টি হাসি।

বললাম, হ্যা। কিন্তু কেন বলো তো?

আপনার সঙ্গে আমার মা কথা বলবেন।

দেখলাম অল্প দূরে কালো বোরখা পড়া অন্যদিকে মুখ ফিরে একজন মহিলা দাড়িয়ে।

মেয়েটি তার মাকে হাত ধরে আমার সামনে নিয়ে এলো।

মহিলা কাছে এসে আমাকে সালাম করে ম্লান হেসে বললেন, ভাইজান, কেমন আছেন?

আমি চিনতে পারলাম না। স্মৃতিশক্তি এখন অনেক কমে গেছে। বললাম, আপনি কি...?

আমি পরী।

চমকে উঠলাম। পরীকে দেখে মনে হলো, কোনো এক সময় স্বপ্ন দেখেছিলাম বলেই হয়তো আজ তা বাস্তব হলো। আশ্চর্য! মানুষের হৃদয়ের স্বপ্ন কি কখনো বাস্তব হয়। পরী ছিল আমার সহকর্মী বন্ধু আবু তাহেরের স্ত্রী। আমরা তখন পাকিস্তান নৌবাহিনীতে চাকরি করতাম। করাচি বন্দরে ছিল আমাদের কর্মস্থল। তাহের–পরী তখন করাচিতে নতুন ঘর বেধেছে।

১৯৭১ সালের মার্চ মাস। ছুটি। তাহেরের ছুটি শেষ। আমি ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে কোনো মতে ছুটির ব্যবস্থা করি। পরিস্থিতি খারাপ হওয়ায় আশংকার পরিবার নিয়ে থাকা ঠিক নয় ভেবে আমি ৮ মার্চ রাতের ফ্লাইটে পরীকে নিয়ে ঢাকায় ল্যান্ড করি। তখন বাংলাদেশের অবস্থা আন্দোলনে মুখরিত। পরীকে নিয়ে রাত সাড়ে দশটার *বাহাদুরাবাদ মেল* ধরি। ৯ মার্চ এই সান্তাহার পৌছি। আবু তাহের আগেই বাড়িতে চিঠি লিখে দিয়েছিল। সেই মোতাবেক পরীর বড় ভাই সান্তাহার আসেন। তার হাতে পরীকে তুলে দিই। সে এক অদ্ভুত যুগ। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের তখন প্রথম ভাঙন ধরতে শুরু করেছে। এক একটা খবর বেরোয় আর সমস্ত বাংলাদেশের মানুষ যেন চমকে ওঠে।

আসে ২৫ মার্চ। পৃথিবীতে কখনো কখনো চেঙ্গিস খানদের আগমন ঘটে। তখন ইয়াহিয়া খানের লক্ষ লক্ষ মানুষ হত্যা করে তাদের পাপের ঋণ পরিশোধ করে। এই যেমন আমাদের মুক্তিযুদ্ধ। তখন কতো পরিবার যে কতোভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। শ শ বাংলাদেশি সৈন্যদের সঙ্গে আবু তাহেরও *কোয়েটার কুলি ক্যাম্পে* তিন বছর বন্দী জীবন কাটায় আর নওগার কাছাকাছি কোনো গ্রামে তার স্ত্রী পরীর জীবনে এক অসতর্ক মুহূর্তে নেমে আসে চূড়ান্ত অপমানের জ্বালা। সে কথা পরে লিখবো।

আমি পরীর গভীর কালো চোখের ওপর চোখ রাখলাম। টল টল করছে পানি। পাশে মেয়েটি দাড়িয়ে। পরীর ফর্শা–উজ্জ্বল–সুন্দর মুখ শিশুর মতো নিষ্পাপ। কিন্তু দেহ বিষাদের আবরণে ঢাকা। তেত্রিশ বছর পর কোনো পরিচিত মানুষের সঙ্গে দেখা হলে অনুভূতি কেমন হতে পারে? বললাম, কেমন আছো পরী?

পরী মাথা কাত করলো। কিন্তু ততোক্ষণে ট্রেন প্রায় প্ল্যাটফর্মের কাছাকাছি এসে গেছে।

জিজ্ঞাসা করলাম, তোমরা কতোদূর যাবে?

রাজশাহী।

আমিও। চলো, আগে ট্রেনে উঠি।

একজন প্যাসেঞ্জারের সঙ্গে সিট বদল করে পরী ও তার মেয়ের সামনের সিটে বসলাম। ট্রেন আমার পেছন দিকে ছুটে চলেছে। মনে হলো চোখ বুজে সমস্ত অতীত দেখতে পাচ্ছি। করাচির এক আবাসিক এলাকায় এক ভাড়া বাসায় তাহের তার নতুন বৌ পরীকে নিয়ে থাকতো। ছুটির দিনগুলো তাহের–পরীর সান্নিধ্যে আমার কেটে যেতো। কতো সুন্দর ছিল ওদের সংসার, ওদের জীবন। কিন্তু একাত্তর ওদের সমস্ত জীবন ওলট–পালট করে দিল। ভাবতে লাগলাম একজন নারী যার হৃদয় এতো প্রশস্থ, যে বাল্যকাল থেকেই ধার্মিক ও পর্দাশীল, যার পোশাক এতো পরিচ্ছন্ন ও শালীন, যার হাসি এতো নির্মল ও প্রাণবন্ত, যার দেহ এতো সুন্দর ও কোমল, স্বামীর প্রতি যার বিশ্বাস ও ভালোবাসা ছিল অঢেল, সাময়িক উত্তেজনায় সে কি করে অন্য পুরুষকে...? তবে কি পৃথিবীতে স্বামী–স্ত্রীর মাঝে বিশ্বাসের পতন ঘটেছে? পরীর দিকে তাকালাম। বিষণ্ন ও উদাসভাবে আমাকে দেখছে। মানুষের তো কতো রকমের বিষাদ থাকে মনে।

৭৩ সালে পাকিস্তান থেকে ফিরে আসার পর তাহের নৌবাহিনীর চাকরি ছেড়ে দেয় এবং কোনো বাণিজ্যিক জাহাজে ওঠে। মনে মনে হিসাব করলাম ত্রিশ বছর অতীত হয়েছে। এতো দিনে পরী নিশ্চয় তাহেরকে ডিভোর্স করেছে, অন্যত্র বিয়ে হয়েছে। অনেক এলোমেলো প্রশ্ন আমার মনের মধ্যে ভিড় করতে লাগলো। মেয়েটির মুখের দিকে তাকালাম। না হোক তাহেরের মেয়ে, পরীর মেয়ে তো। খুব মায়া লাগলো। জিজ্ঞাসা করলাম, মামণি, তোমার নাম কি?

ফাতেমা।

ফাতেমা আমার কাছে খুব প্রিয় একটি নাম। তুমি নিশ্চয় পড়াশোনা করছো?

হ্যা মামা, আমি ইউনিভার্সিটিতে অনার্স ফাইনাল ইয়ারে এখন।

আমার খুব ভালো লাগলো। ইউনিভার্সিটির সব মেয়েরাই কি এমনি আন্তরিক?

রাজশাহী স্টেশনের বাইরে একে তাদের কাছ থেকে বিদায় নেয়ার চেষ্টা করলাম। কিন্তু ফাতেমা এসে হাত ধরলো। বললো, মামা, আপনার সঙ্গে আমাদের অনেক কথা আছে। আমার মা প্রতিদিন আপনার কথা বলেন।

কেন?

আমাদের বাসায় চলুন, সব বলবো।

রিকশায় ওঠে মা–মেয়ের পেছনে চললাম।

ইউনিভার্সিটির কাছাকাছি এলাকায় একটি তিন রুম বিশিষ্ট কোয়ার্টারের নিচ তলায় মা–মেয়ে ভাড়া থাকে। একটি রুমে তাদের আত্মীয় ভিন্ন একটি পরিবার থাকে। বাসায় পৌছে ফাতেমা আমাকে সরাসরি প্রশ্ন করলো, আমার বাবার সঙ্গে কি আপনার যোগাযোগ আছে?

মেয়ের প্রশ্ন শুনে অবাক হয়ে পরীর মুখের দিকে তাকালাম।

পরী বললো, ফাতেমা আমার পালিত মেয়ে, আবু তাহেরকেই ও বাবা বলে জানে।

বিস্ময়াভিভূত হয়ে প্রশ্ন করলাম, তুমি কি আবু তাহেরকে (স্বামী) তালাক করোনি?

না।

এই *না* শব্দটি যে আকাশ–বাতাস বিদীর্ণ করে আমার হৃদয়কে গভীরভাবে স্পর্শ করলো। কতো মানুষ কতোভাবে যে প্রিয়জনের প্রতীক্ষায় কাটায়! জীবন আছে, জীবনের কথা আছে, জীবনের সমস্যা আছে, জীবনের আকঙ্ক্ষা আছে, জীবনের সাধ–আহ্লাদ আছে, জীবনের দোষ–অপরাধ আছে, তারপরও মানুষ প্রতীক্ষা করে। তাই বলে ত্রিশ বছর ধরে একজন নিরুদ্দেশ মানুষের জন্য প্রতীক্ষা! পরী সম্পর্কে আমার ধারণা

পাল্টে গেল। ভীষণ রকম ব্যথিত এবং কৌতূহলী হয়ে বললাম, ১৯৮০ সাল চট্টগ্রাম বন্দরে বিএনএস আলী হায়দার জাহাজে তাহেরের ঠিকানাহীন শেষ চিঠি পেয়েছিলাম। তখন সে কোনো বাণিজ্যিক জাহাজ থেকে নিউ ইয়র্কে পলায়ন করেছে। এরপর আর কোনো চিঠি পাইনি।

তারপর বললাম, আজ আমার বাড়ি ফেরার কথা আছে। ছেলেমেয়ের সঙ্গে দেখা করে বিকেল তিনটায় এ *বরেন্দ্র ট্রেনেই* আবার ফিরবো। স্টেশনে আমাকে নেয়ার জন্য লোক অপেক্ষা করবে। অন্য একদিন সময় নিয়ে আসবো, তোমার সঙ্গে কথা বলবো, আজ আসি পরী।

তাদের কাছ থেকে বিদায় নিলাম।

বাংলাদেশ নৌবাহিনী থেকে অবসর নিয়েছি পুরো তেরো বছর হলো। এর মধ্যে খবর পেয়েছি সহকর্মী বন্ধুদের অনেকে মারা গেছেন। অনেকে কঠিনভাবে অসুস্থ হয়েছেন। কারো কথাই যেন ভুলতে পারিনে। পারিবারিক কারণে আবু তাহের নিরুদ্দেশ। আমার আকাঙ্ক্ষা ছিল বড় পরিমিত এক টুকরো অবসর। এক বিন্দু বিশ্রাম আর অঢেল শান্তি। এই যেমন তেত্রিশ বছর পর পরী ও তার পালিত মেয়ের সঙ্গে দেখা হওয়া, আমার মনে হলো এটাও জীবনের এক শান্তিময় অংশ।

এক বিকেলে রাজশাহী গিয়ে পরীর বাসায় উঠলাম। মা-মেয়ে খুব খুশি হলো। রাতে খাওয়ার পর তারা আমার মুখোমুখি বসলো।

বললাম, এখন বলো পরী, তুমি কেমন ছিলে?

পরীর চোখে মুখে বিষাদের কালিমা, মাথা নত।

মেয়েটি বললো, মা ভালো নেই মামা। হার্ট বেড়ে গছে, সব সময় বুকে ব্যথা। এ জন্য আমি হল ছেড়ে দিয়ে এই বাসা ভাড়া নিয়েছি। মাকে সব সময় সঙ্গে রাখি। কাছেই ক্লিনিক আছে। বিশেষজ্ঞ ডাক্তার আছেন। কিন্তু সমস্যা হলো, তাকে চিন্তামুক্ত রাখতে পারি না, সব সময় বাবার চিন্তা করেন। আপনি কি আমার মায়ের জন্য কিছু করতে পারেন?

তোমার বাবা তো আমার কাছ থেকেও হারিয়ে গেছেন, আমি কি করতে পারি মামণি?

আপনি গতবারে মাকে স্বামী-তালাকের কথা বলেছিলেন কেন বলুন তো?

তোমার বাবা আমার কাছে সেই ধরনের প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছিলেন।

মেয়েটি খুব তীক্ষ্ণ এবং বুদ্ধিমান। আমাকে তার মা-বাবা সম্পর্কে খুটিয়ে খুটিয়ে প্রশ্ন করতে লাগলো।

বললাম, ১৯৭৩ সালের মাঝামাঝি সময়ে পাকিস্তানে বন্দী বাঙালি সৈন্যদের রিপাট্রিয়েশন শুরু হয়েছিল। ১৯৭১ থেকে ১৯৭৩ ততোদিনে অনেকের সংসার ভেঙে গেছে। তোমার বাবা ঢাকা সেনানিবাসে অবস্থিত বাংলাদেশ নৌবাহিনীর ঘাটি *বিএনএস হাজী মহসীন*-এ রিপোর্ট করে এক মাসের ছুটি নিয়ে বাড়ি যান। তারপর...।

তারপর বলুন। ফাতেমা আমাকে তাগাদা দিল।

বললাম, তারপর আর বলা যায় না। সেটা তোমার মা-বাবার একান্ত ব্যক্তিগত বিষয়। প্রতিটি মানুষের জীবনে একটি অন্ধকার দিক আছে যা সে অন্যকে দেখাতে চায় না। আমি থেমে গেলাম।

মেয়ে তার মায়ের মুখের দিকে তাকালো। হয়তো তার শরীরের অবস্থার কথা চিন্তা করলো। কি ভেবে যেন সেও থেমে গেল।

বুঝতে পারলাম মা তার মেয়েকে গোপন কথাগুলো বলেনি।

মনে আছে আমি তখন চট্টগ্রাম নৌ-ঘাটিতে (বর্তমানে *বিএনএস ঈশা খা*) কর্মরত। ছুটি শেষ না করেই আবু তাহের সেখানে জয়েন করেন। আবু তাহের তার কথাগুলো আমাকে ঠিক এভাবেই বলেছিল, শরতের এক স্নিগ্ধ সকালে বাড়ি পৌছালাম। আমাকে হঠাৎ দেখে পরী যেন কেমন হতবাক হয়ে গেল। আমাকে সালাম

করে কাদতে লাগলো। তারপর বৃদ্ধ ও অসুস্থ বাবার কাছে বসলাম (তাহেরের মা তখন জীবতি নেই)। আমি হঠাৎ বাড়ি এসেছি খবর পেয়ে পাড়া-প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজন বাড়ি ভরে গেল। সারা দিন পরীকে কাছে পেলাম না। বড় টিপিটিপি পায়ে যেন সন্ধ্যা নেমে এলো সেদিন আমার বাড়িটাতে। সমস্ত কাজে ও কোলাহলের মধ্যেও কোথায় যেন একটা আতঙ্ক লুকিয়ে ওৎপেতে ছিল। রাতে পরীকে কাছে পেলাম। কিন্তু পরী জড়সড়ো আড়ষ্ট। পরী কাদছে শুধুই কাদছে। তাকে গভীর মমতায় বুকের মাঝে টেনে নিলাম। কিন্তু একি! টর্চ লাইট জ্বেলে পরীর শরীর পরীক্ষা করে নিশ্চিত হলাম আমার পরী অন্তঃসত্ত্বা।

দীর্ঘ ত্রিশ বছর পর স্মৃতি রোমন্থন করে হতভাগ্য আবু তাহেরের জীবনের এই বাস্তব ঘটনা লিখতে আমার ভীষণ কষ্ট হচ্ছে। আবু তাহের ও পরী দুটি বাস্তব চরিত্র। আবু তাহের একজন মানুষের নাম, একজন বন্ধুর নাম, একটি উদার, প্রশস্ত ও ক্ষমাশীল হৃদয়ের নাম। গুডবাই আবু তাহের। তুমি ভালো থেকো।

রাজশাহীর সেই বাসায় মা-মেয়ের সামনে বসে তাহেরের কথাই ভাবছিলাম। আমার স্মৃতির দুয়ার যেন খুলে গেল। সেই রাতে স্ত্রীর এই অবস্থা দেখে আবু তাহের খুব রেগে গিয়েছিলেন। নিজের জীবনের পরাজয়ে রাগ-দুঃখ-বেদনায় হারিকেনের ক্ষীণ আলোতে সে কিছুক্ষণ ঘরময় পায়চারী করলো। সে ভাবতে লাগলো হত্যা, না আত্মহত্যা? সেই রাতে তার মনের বেদনাময় যন্ত্রণার কথা প্রকাশ করতে গিয়ে সে আমাকে বলেছিল, গাধা একটি বোকা প্রাণী আর আমি হলাম একজন বুদ্ধিমান কাপুরুষ। যাকে এতো স্নেহ করি, ভালোবাসি, বিশ্বাস করি, সে যে এতো নিচ, এতো প্রবঞ্চক হতে পারে কখনো ভাবিনি। বুঝতে পারলাম এতোদিন আমি একটা অপমানিত জীবন যাপন করেছি। শুধু এই বাংলাদেশের অসংখ্য মেয়ের প্রতীক হয়ে সে যেনো আমার মনের মধ্যে গভীর দাগ কেটে রেখে গেল যা সহজে মোছার নয়। আঘাত যতো গভীরই হোক, আমার সিদ্ধান্ত আমাকেই নিতে হবে। একমাত্র বিবেকবান ও সংযমী পুরুষরাই এ জাতীয় ঘটনায় ত্বরিত ও সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

আমি আবেগে ভারাক্রান্ত হয়ে তাহেরকে প্রশ্ন করেছিলাম-তুমি কি পরীকে ক্ষমা করলে?

তাহের প্রতিউত্তরে বলেছিল, হ্যা, অনেকটা তাই। মিছামিছি জীবনটাকে এতো জটিল করে কি লাভ। তাছাড়া যৌনতায় কৃচ্ছ্রতা সাধন করা হয়তো সব সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব নয় এবং নয় বলেই এ বিষয়টা মানুষের জীবনে কঠিন সমস্যার সৃষ্টি করে। মনকে এই বলে সান্ত্বনা দিলাম, যে এ কাজ করেছে সে আমার একজন পরিচিত পুরুষ। আর পুরুষরা সব সময়ই প্রতারক। আমি জীবনকে অপহরণ করিনি, জীবনের কিছু ভণ্ডামি যা আমার হৃদয়কে অহরহ কঠিন যন্ত্রণায় দগ্ধ করেছে। তা থেকে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের এই জীবন থেকে অনেক দূরে চলে যেতে চাই।

সবশেষে তাহের আমাকে বলেছিল, তার শরীর তাকে কষ্ট দিয়েছে। পরদিন পরীকে নিয়ে তার বাবার বাড়ি গেলাম। তার মাকে গোপনে বললাম, বড় দুলাভাইকে ডেকে আগে তার গর্ভপাতের ব্যবস্থা করুন, তারপর আমার নামে মিথ্যা কোনো অপবাদ দিয়ে স্বামী তালাক করাবেন।

আবার বাড়িতে ফিরে এলাম, বৃদ্ধ-অসুস্থ বাবার সঙ্গে কয়েদিন কাটালাম। ঢাকায় আসার পথে পরীর সঙ্গে শেষ দেখা করার জন্য আবার শ্বশুরবাড়ি গেলাম। তখন তার গর্ভপাত করানো হয়েছে। সে মেঝেতে শুয়ে ছিল। মনে হলো তার নিম্নাংগ অচল হয়েছে। আমি ঘরে গিয়ে খাটের ওপর বসলাম। পরী হামাগুড়ি দিয়ে আমার পা ধরার চেষ্টা করলো। আমি উঠে গিয়ে হাটু মুড়ে তার পাশে বসলাম। তার চোখের পানি মুখে দিয়ে বললাম, কিছু কিছু ভুল আছে যেগুলোর কোনো ক্ষমা হয় না। তুমি আমার রইলে না। কিন্তু চিরকালই আমি তোমার রইলাম। আসি পরী।

আমি নিজে একজন আবেগ প্রবণ ও ভীরু প্রকৃতির মানুষ। পরী ও ফাতেমার সামনে এসে আবু তাহেরের কথাগুলো ভাবতে ভাবতে চোখে পানি এলো। পৃথিবীতে কতো মানুষ আছে। তাদের কতো প্রকার ধর্ম আছে।

সবাই তাদের সৃষ্টিকর্তার কাছে মানুষের মঙ্গল কামনায় কতো রকম প্রার্থনা করছে। তবু মানুষে মানুষে এতো প্রবঞ্চনা–প্রতারণা–প্রতীক্ষা কেন? পরীর প্রতি আমার মনে হয়তো ক্ষোভ ছিল। তাই বলেই ফেললাম, তুমি এমন ধরনের অপরাধ করবে কখনো ভাবিনি পরী।

পরী লজ্জিতভাবে একবার তার মেয়ের দিকে তাকালো। তারপর বললো, সে সময় কিছু গুজব ও খারাপ খবরের কারণে একটি ভালো জীবন যাপনের কৌশল হারিয়ে ফেলি। লোকটি আমাকে প্রতিদিন মিথ্যা কথা বলে কৌশলের ফাদে ফেলে অশালীন জীবন যাপনে প্রলুব্ধ করে।

এমন সময় ফাতেমা অস্ফুট স্বরে চিৎকার করে বললো, ছিঃ মা, ছিঃ।

ফাতেমার একটি মাত্র ছিঃ শব্দে পৃথিবীর সমস্ত অশ্লীল মানুষের হৃদয় কেপে উঠলো। পরী জ্ঞান হারালো, মেঝের ওপর লুটে পড়লো। আমি নির্বাক সেদিকে চেয়ে রইলাম।

মনে আছে, সেদিন রাত গভীর থেকে গভীরতর হতে লাগলো, রাজশাহী শহরের মানুষেরা ঘুমে অচেতন হয়ে পড়লো। মা ও মেয়ের মাঝখানে আমি কেমন যেন অসহায়ত্ব বোধ করতে লাগলাম। পরী যদি মারা যায়? আবু তাহের বা পরীর মা–বাবা কি জীবত আছেন? একজন স্বামী বা একজন পিতা সম্ভবত তার স্ত্রী বা কন্যার কাছ থেকেই সবচেয়ে বেশি কষ্ট পায়। মেয়েটি খুব কষ্ট করতে লাগলো। কিভাবে শুশ্রূষা করলে তার মায়ের জ্ঞান ফিরে আসবে সেটা সে জানতো। ধীরে ধীরে পরীর জ্ঞান ফিরে এলো। নিজেকে খুবই অপরাধী মনে হতে লাগলো, কেন যে হঠাৎ পরীর সঙ্গে দেখা হলো!

পরদিন আমার বাড়ি আসার সময় মেয়েটি আবার বললো, মামা, আমার অপরাধী মায়ের জন্য কি কিছুই করা যায় না?

বললাম, আমেরিকা অনেক বড় দেশ, নিউ ইয়র্ক অনেক বড় শহর। তোমার বাবা যতোক্ষণ খোজ না দেবেন ততোক্ষণ তাকে খুজে পাওয়া সম্ভব নয়। তুমি তার আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে, বিশেষ করে তার বোনদের সঙ্গে যোগাযোগ করো, তাদের কাছে যদি ঠিকানা পাও, আমাকে জানাবে। আমি আপ্রাণ চেষ্টা করবো। ফাতেমাকে আমার ঠিকানা দিয়ে বিদায় নিলাম।

গত অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি সময়ে হঠাৎ আবু তাহেরের একটি চিঠি পাই। চিঠিটি পড়ে খুবই বিস্মিত হই। চিঠিতে যা লেখা ছিল তার সারমর্ম হলো যে, তিনি আমার চিঠি পেয়েছেন। তিনি জানতেন না যে, পরী এখনো তার প্রতীক্ষায় রয়েছে। তিনি শিগগিরই দেশে ফিরবেন। এই চিঠির ভেতর পরীর নামে যে চিঠি দিয়েছেন তা যেন কষ্ট করে পরীর হাতে পৌছে দিই... ইত্যাদি।

পরদিনই রাজশাহী ছুটলাম। কিন্তু পরীর বাসায় পৌছে হতাশ হলাম। তারা নেই।

প্রতিবেশী মহিলাটি বললেন, ফাতেমার মায়ের খুব অসুখ, চিকিৎসার জন্য তাদের ইনডিয়া যাওয়ার কথা। আপনি নওগায় ফাতেমার মামার বাড়িতে খোজ নিন। মহিলা ঠিকানা দিলেন।

রাজশাহী থেকে বাসে নওগা গেলাম। তখন নওগায় বন্যা। নৌকাযোগে ফাতেমার মামবাড়ি যখন পৌছালাম তখন সন্ধ্যা। এখানে এসে জানলাম, পরীর অবস্থা অতি সঙ্কটাপূর্ণ হওয়ায় তাকে তড়িঘড়ি ঢাকার মিরপুরে *ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন*–এ নেয়া হয়েছে। রাতে সেখানেই থাকতে হলো। পরদিন সকালে নওগা এসে ঢাকার বাস ধরলাম।

ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশনে যখন পৌছালাম তখন বিকেল। পরীর ক্যাবিন খুজে বের করলাম। পরী চোখ বুঝে চিৎ হয়ে শুয়ে আছে, হয়তো ঘুমিয়ে আছে। ফাতেমা আমাকে নিয়ে ওয়েটিং রুমে বসলো। ফাতেমাকে খুব ক্লান্ত এবং পরিশ্রান্ত মনে হলো। তার চোখে–মুখে বেদনা ও হতাশার ছাপ। বললাম, তোমার মা এখন কেমন আছে?

খুব একটা ভালো নেই। অপারেশন করা হয়েছে, শরীরে *পেস মেকার* সেট করা হয়েছে। ডাক্তার বলেছেন, তিনি আর বেশি দিন বাচবেন না।

ফাতেমা কাদতে লাগলো।

আবু তাহেরে ঠিকানা জানতাম না বা তার কাছে কোনো চিঠি লিখিনি। আমার কাছে যা আছে তা একটা *ডামি* চিঠি। এসব কথা ফাতেমার সঙ্গে আলোচনা করার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু পরীর শারীরিক অবস্থা ও ফাতেমার কান্না দেখে হতবাক হয়ে পড়লাম। শুধু বললাম, তোমার বাবার একটা চিঠি পেয়েছি।

চিঠিটা ফাতেমার দিকে এগিয়ে দিলাম। কিন্তু ফাতেমা কোনো আগ্রহ দেখালো না বা চিঠি নিল না।

হতাশ হলাম।

ফাতেমাই আমাকে বললো, আপনি জেনে হয়তো ব্যথিত হবেন যে, ওটা আমার বাবার চিঠি নয়। কোথাও কারো কাছে বাবার ঠিকানা সংগ্রহ করতে পারিনি, শেষে আমার এক বান্ধবীর সহযোগিতায় চিঠিটি আমিই আপনার কাছে পাঠিয়েছি।

মেয়েটি খুব সুন্দর করে কথা বলতে পারে। কিন্তু রাজনীতিবিদদের মতো সুন্দর করে মিথ্যা বলতে পারে না।

ফাতেমা আরো বললো, আমার বুদ্ধি-জ্ঞান হওয়ার পর থেকে দেখেছি আমার মা তার একটি অপরাধের জন্য অনুতপ্ত হতে হতে নিজেকে নিঃশেষ করে দিয়েছেন। বাবার কাছে ক্ষমা পাওয়ার জন্য ত্রিশ বছর ধরে ধ্যান করছেন। আমাকে ক্ষমা করবেন মামা, চিঠিটি মায়ের হাতে আপনি দেবেন। একজন মুমূর্ষু মানুষের সঙ্গে সাময়িক প্রতারণা যদি তাকে স্বর্গীয় আনন্দ দেয় ক্ষতি কি!

ফাতেমা তার মাকে ডেকে বললো, মা, বাবার চিঠি এসেছে।

আমি রঙিন খামটি পরীর হাতে তুলে দিলাম। পরীর ফর্শা শীর্ণ হাত কাপছে। প্রথমে সে আমাকে লেখা চিঠি পড়লো, তার ঈষৎ পুরো শুকনো ওষ্ঠে মলিন হাসির রেখা ফুটে উঠলো। তারপর তার নাম লিখা চিঠির মুখ খুললো, একটি সুন্দর গৃটিং কার্ড বেরোলো, সেটার ওপর বড়ো বড়ো করে লেখা ছিল *তোমার জন্য ভালোবাসা*।

আমি অবোধ শিশুর মতো দাড়িয়ে রইলাম।

ঈশ্বর, তুমি পরীকে ক্ষমা করো।

বড়গাছা, জয়পুরহাট থেকে

asabalibd@yahoo.com

আমার বাবুর বাবা

প্রায়ই তোমাকে চিঠি লিখি। তবু পত্রিকার পাতায় তোমাকে লিখতে ইচ্ছে হলো। জানি না, এটা ছাপানো হবে কি না। যদি ছাপানোও হয়, সে সময় হয়তো তোমার থেকে অনেক দূরে থাকবো কিংবা হয়তো তুমিই আমাকে দূরে সরিয়ে দেবে।

পথ চলতে গিয়ে তোমার সঙ্গে দেখা হলো, একে অপরকে চেনা হলো, অন্তরঙ্গতা হলো। হঠাৎ এক সময় খেয়াল করলাম, তুমি ছাড়া আমি অচল। জানো বাবুর বাবা, আমার জীবনটা যে এতো জটিল হয়ে যাবে, কখনো ভাবিনি। তোমার মতো একজন আমার এতো প্রিয়, এতো আপন হয়ে উঠবে কল্পনাও করিনি। মানুষ যা ভাবে না তাই তো হয়! যা সম্ভব নয় তা-ই আমি চেয়েছি, হয়তো তুমিও তা-ই চেয়েছো।

নিষিদ্ধ জিনিসের প্রতি মানুষের আকর্ষণ বরাবরই বেশি। কিছুদিন থেকে তুমি আমাকে এতো ভালোবাসছো যে, সব কিছু আমার কেমন স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছে। এতো আদর দিচ্ছ যে, সারাক্ষণ ঘোরের মধ্যে কাটছে আমার। এতো আনন্দ, এতো ভালোবাসা আমার জীবনে যে আবার ফিরে আসবে, কখনো ভাবিনি।

অবাক লাগে, তুমি কি সেই মানুষ যে পলে পলে আমাকে কষ্ট দিতে! প্রতারণার জালে আটকে রেখে আমাকে পিষে ফেলতে চাইতে? মাঝে একটি বছর কতো কষ্ট দিয়েছো তুমি! আমাকে দেখিয়ে দেখিয়ে যা ইচ্ছে তা করেছো। সহ্য করতে পারতাম না, খুব কষ্ট হতো। যদি প্রতিবাদ করেছি, তুমি মিথ্যে বলেছো, আমাকেই দোষারোপ করেছো। ঘৃণার দৃষ্টি দিয়ে আমাকে দগ্ধ করেছে। ওই একটি মেয়ের জন্য আমার জীবন কি দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল! জান, সেসব দিনগুলো মনে পড়লে বোবা হয়ে যাই।

তুমি আমার মনের ওপর অত্যাচার করেছিলে। এ জন্য আমি আজও খানিকটা অসুস্থ।

এখন তুমি বলো, ওসব কথা মনে রেখো না।

ভুলতে তো চাই। কিন্তু মানুষ সুখের কথা যতো সহজে ভুলতে পারে, কষ্টের কথা ততো সহজে ভুলতে পারে না। তাই আমি মনে করতে না চাইলেও মনে পড়ে যায়। তুমি কি ভুলতে পারবে তাকে যার জন্য আমাকে এতো কষ্ট দিয়েছো? পারবে না। তোমার পক্ষে তা সম্ভব নয়। বরং সে যদি আবার তোমার কাছে আসে তুমি হয়তো আবারও আমাকে কষ্ট দেয়া শুরু করবে। কেউ কি সহ্য করতে পারে বলো, তার ভালোবাসার মানুষের অন্তরে আরও একটি সত্তা বসবাস করুক? তুমি কি সহ্য করতে পারতে যদি আমি এমন করতাম? তুমি হয়তো আমাকে মেরেই ফেলতে।

মাঝে মধ্যে তুমি এমন আচরণ করো যেন আমি তোমার সত্যিকারের বৌ। নানান ব্যাপারে আমার পায়ে অদৃশ্য শিকল পরাও তুমি। তোমার বেধে দেয়া সমস্ত আদেশ এবং নিষেধ মেনে চলার চেষ্টা করি। তবু একটু ভুল হয়ে গেলেই তুমি অবুঝের মতো রেগে যাও। আশপাশে মানুষের ভিড় আর মনে থাকে না তোমার। যা ইচ্ছে তা–ই বলো।

অপমানে নীল হয়ে যাই। চোখে পানি এসে যায় আমার। ঠিক তখনই তুমি হাসতে শুরু করো। তখন তোমাকে দেখতে কি যে সুন্দর লাগে! আমার মন সঙ্গে সঙ্গে ভালো হয়ে যায়। হঠাৎ তোমার সুন্দর চোখ দুটো দিয়ে এতো গভীরভাবে আমাকে দেখো যে, কেমন অবশ হয়ে যাই। তুমি যখন পাশে থাকো তখন আর কোনো কিছু দেখতে ইচ্ছে হয় না আমার। তবু তুমি কতো কিছু দেখতে বলো। অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমাকে সেগুলো দেখতে হয়।

বিশ্বাস করো, তোমার থেকে চোখ ফিরিয়ে অন্য কিছু দেখার কোনো আগ্রহ কখনো আমার হয় না। তুমি রাগের মাথায় কতো কিছু বলে ফেলো। পরে মাথা ঠাণ্ডা হলে যখন আমি মন খারাপ করি তখন হাসতে হাসতে বলো, এতো কথা মনে রাখতে নেই। মাথা ঠিক ছিল না। তাই বলেছি। সত্যি সত্যি বলিনি।

সেদিন বললে, আমার সঙ্গে থাকলে কখনোই তোমার কোনো অসুখ করবে না।

তুমি কি সত্যি বলেছো, নাকি তখনো মাথা ঠিক ছিল না? কারণ তখন আমি পাশে থাকায় ভীষণ পাগলামি করছিলে। মাঝে মধ্যে তুমি মানুষজনের সামনে এমন পাগলামি শুরু করো যে আমি খুব অসহায় হয়ে পড়ি। তখন নিজেকে খুব নিঃসঙ্গ মনে হয়। তুমি যখন অমন পাগলামি করো তখন আমার খুব ইচ্ছে করে, তোমাকে জড়িয়ে ধরে চুপচাপ বসে থাকতে। কিন্তু মানুষের ভিড়ে তা হয়ে ওঠে না। তখন আমার মন খুব খারাপ হয়ে যায়।

তোমার–আমার মধ্যে কখনও বিচ্ছিন্নতা আসবে এটা ভাবতে আমার বড় কষ্ট হয়। এমন হলে আমার জীবন থেকে হাসি, আনন্দ সব হারিয়ে যাবে। যদি আমরা সারা জীবন এক সঙ্গে থাকতে পারতাম তাহলে কতোই না ভালো হতো। কেন যে তুমি এতো দেরি করে এ পৃথিবীতে এলে? আমার চেয়ে আর কয়েক বছর আগে এলে

এমন কি ক্ষতি হতো? শুধু এটুকু ভুলের জন্য চিরটা জীবন তিলে তিলে দগ্ধ হতে হবে আমাকে। এই সমাজ আমাদের ভালোবাসা মেনে নেবে না। শুধু এই সমাজের রক্ত চোখের জন্যই আমরা আমাদের শেষ করে দেবো? তুমি কেন কোনো উপায় বের করতে পারো না বাবুর বাবা?

বাবুর বাবা, তুমি কি রাগ করছো আমাদের কথা সবাই জানলো বলে? আসলে জানো, তুমি আমার জীবনে এমন একটা কিছু যে, সবাইকে আমার চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে করে। তোমার সত্যিকার ভালোবাসা আমিই পেয়েছি। আর কেউ এর অধিকার করতে পারে না। সবাই জানুক, পৃথিবীর কোনো প্রান্তে দুজন মানব-মানবী স্বর্গীয় ভালোবাসার বন্ধনে জড়িয়ে আছে। তারা কখনো এক হতে না পারুক, একে অপরকে ভালোবেসেই তারা জীবনের শ্রেষ্ঠ সুখ অনুভব করে।

বাবুর বাবা, আজ সবাই জানুক, আমি তোমার সন্তানের গর্বিত মা হতে চাই। আমি যে তোমাকে বড্ড বেশি ভালোবাসি বাবুর বাবা! জীবনের কোনো এক সময় তুমি এসে তোমার ভালোবাসার স্মৃতি আমাকে দিয়ে যেও। শুধু ভালোবাসা দিবসে নয়, জীবনের প্রতি মুহূর্তে আমার ভালোবাসা নিয়ে তুমি নিজেকে রাঙিও।

তোমার **সোনা বৌ**

নাম ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক

কুকুরের প্রেম বিরহ

– ড. মোহাম্মদ নাসিমুল ইসলাম

দ্বীপদেশ সামোয়ায় প্রতিবেশী মি. ভার্গিজ-এর সঙ্গে সম্পর্কটা আর গভীর হলো না। অথচ সে ছিল অতি বন্ধুবৎসল ও অমায়িক এক ইনডিয়ান। দেখা হলে নির্মল হাসি বিনিময় হতো আমাদের।

দুটো পোষা কুকুর ছিল তার। একটি পুরুষ, আরেকটি নারী। সেই কুকুর দুটির কারণেই আমাদের সম্পর্কের এই বর্তমান স্থবিরতা। মেয়ে কুকুরটি ছিল সুশ্রী, ধবধবে শাদা, দেখলে মনে হতো যেন এক গোছা কাশফুল। বড্ড আয়েশি ছিল সে চলনে। দিন-রাতের বেশির ভাগ সময় শুয়ে-বসে কাটাতো আর আমার সীমানায় মলত্যাগ করে আমায় ধন্য করতো।

অন্যদিকে পুরুষ কুকুরটি ছিল দেখতে কালো এবং মেজাজে রুক্ষ। চলন-বলনে তার ছিল ভিলেইন ভাব, তার ওপর সে ছিল চূড়ান্ত দুশ্চরিত্রের অধিকারী। এ তল্লাটে তার কাছে ইজ্জত হারায়নি এমন মেয়ে কুকুর ছিল না বললেই চলে। তার কারণে আশপাশের সকল কুকুর সব সময় শ্লীলতাহানির ভয়ে তটস্থ থাকতো। আমার সদর দরজার ঠিক সামনে সে মলত্যাগে আনন্দ পেতো। সুযোগ পেলে আমার অন্দর মহলে প্রবেশ করে খাবারও সংগ্রহ করতো।

বাইরে সে এমন হলেও নিজ বাড়িতে সে ছিল নিয়ন্ত্রিত। প্রায় সারাক্ষণই শাদা কুকুরের পাশে ঘোরাঘুরি করে সময় কাটাতো। আমার কেন জানি মনে হতো ওদের সম্পর্কে ফাটল ধরেছে। যদিও তাদের অতীত সুসম্পর্কের ব্যাপারে নিশ্চিত ছিলাম না।

তবে এই শাদা-কালো দুটি প্রাণীর কারণে মি. ভার্গিজের বাড়ির প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ছিল নিশ্ছিদ্র। তার বাড়ির চত্বরে অপরিচিত কেউ পা রাখলে তার রক্ষা নেই। সব কিছু ভুলে কুকুর দুটি এক সঙ্গে ঝাপিয়ে পড়তো। সে কারণে নিকটতম প্রতিবেশী হয়েও আমি ওদের ভয় পেতাম। বাড়ি থেকে বের হবার আগে ও পরে ওই দুটো প্রাণীর দিকে তীক্ষ্ম নজর রাখতাম। শেষদিকে ব্যাপারটা এমন হয়ে দাড়ালো যে, নিজের অবচেতন মনেও কুকুর দুটির কর্মকাণ্ড দেখতাম।

আজ যাযাদির ভালোবাসা দিবস সংখ্যায় লিখতে বসে সেই কুকুর দুটির ভালোবাসার ঘটনা মনে পড়ে গেল। অ্যান্ড হোয়াট এ ঘটনা!

আমি যদি ওদের ঘেউ ঘেউ আর শারীরিক ভাষা সঠিকভাবে অনুধান করতে পারি তবে তার মর্মকথা হলো, কালো কুকুরটি ভালোবাসতো শাদা কুকুরটিকে। সে ভালোবাসা ছিল একপেশে। শাদা কুকুরটি তাকে যে পছন্দ করতো না তা বেশ বোঝা যেতো। সারা দিনে অকারণে ঘেউ ঘেউ শোনা গেলেই বুঝতাম শাদা কুকুরটির কাছে বেহায়া কালো কুকুরটি ঘেষতে চাইছে।

আশ্বিন–কার্তিক মাস কুকুরদের মিলনের মরসুম। সে সময়টিতে অকারণে ঘেউ ঘেউও বেশি শোনা যেতে থাকলো। কুকুরটিও *একবার না পারিলে দেখ শতবার* ফর্মূলায় একেবার নাছোড়বান্দা।

সেদিন ছিল রবিবার। সাপ্তাহিক ছুটির দিন। একটু দেরি করেই ঘুম থেকে উঠেছি। ড্রয়িংরুম থেকে বাইরে তাকাতেই দেখি ভার্গিজের শাদা কুকুর আমার আঙিনায় প্রবেশ করেছে।

মনে মনে লাঠি খুজে ফিরছিলাম। লক্ষ্য করলাম, মাত্র কয়েক সেকেন্ডের ব্যবধানে কোথা থেকে যেন অপরিচিত এবং হালকা খয়েরি রঙের এক কুকুর এসে নায়ক বেশে হাজির! মনে হলো সব কিছুই যেন পূর্ব পরিকল্পিত।

দুটি কুকুরই মুখ, মাথা কাছে এনে একে অপরকে কাছে পাওয়ার আনন্দ প্রকাশ করলো।

ভেবেছিলাম, আমার উপস্থিতিতে বিরক্ত ভরে বলেছে, মানুষটা এখানে কি করে? অফিস নেই নাকি? কিন্তু নড়ন–চড়ন দেখে বোঝা গেল বাইরের আলোতে থেকে ভেতরের অন্ধকারে আমার উপস্থিতি ওরা কেউই টের পায়নি। কে জানে, ওরা হয়তো ভার্গিজের কালো কুকুরের অবস্থান নিশ্চিতের পাশাপাশি নিজেদের নিরাপত্তা নিয়ে ফিশফিশিয়েছিল!

যাই হোক। আমার থেকে মাত্র চার পাচ হাত দূরে উভয়ের সম্মতিতে কিছুক্ষণের ভেতর শুরু হলো কসরতের প্রথম পর্ব। মনে হলো ব্যাপারটি যেন প্রাত্যহিক! সব কিছুই পূর্ব নির্ধারিত এবং ছকে বাধা।

কিছু সময় পর কসরতের দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রশান্তির চেহারা নিয়ে দুই দিকে মুখ ফিরিয়ে লটকে থাকলো তারা। ঠিক এমন সময় ঘটনাস্থলে হাজির হলো ভার্গিজের কালো কুকুরটি।

ওর চোখে তীব্র আক্রোশ আর ঘৃণা দেখতে পেলাম। দুই কুকুরের মধ্যবর্তী স্থানে উঠে কিছুক্ষণ চেষ্টা করলো কসরতের প্রথম অধ্যায়। নো ভ্যাকেনসি তাই সুবিধা হলো না। আক্রোশে ঝাপিয়ে পড়লো লটকে পড়া খয়েরি কুকুরটির উপর। রক্তাক্ত করে ফেললো তাকে। লটকে থাকায় ভিলেইনের হাতে শক্ত মার হজম করতে হলো সেই অপরিচিত খয়েটি কুকুরটিকে।

এক পর্যায়ে শেষ হলো দ্বিতীয় অধ্যায়। ছিটকে পড়লো তারা। কালো কুকুরটির কাছে ধরা পড়ে লজ্জাবনত শাদা কুকুর ফেরত গেল ভার্গিজের বাড়ির ভেতর আর মার খাওয়া ফজামিয়া (খয়েরি কুকুর) মজা লুটে লেজ পেছনের দুই পায়ের ভেতর ঢুকিয়ে আস্তে আস্তে চোখের সীমানা থেকে হারিয়ে গেল।

দুর্ভাগা কালো কুকুর ফ্যাল ফ্যাল চোখে বহুক্ষণ দাড়িয়ে থেকে হতাশ মনে ধীরে ধীরে নিঃশব্দে নিজ বাড়ির দিকে পা বাড়ালো।

এই ঘটনার কিছু দিন পর সামোয়া থেকে বিদায়ের প্রাক্কালে ভার্গিজের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ হলো। তাকে তার কুকুর দুটির কথা জিজ্ঞাসা করলাম।

তিনি দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, কিছু দিন আগে অসতর্কভাবে রাস্তা পার হতে গিয়ে কালো কুকুরটি অকালে অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেল আর শাদা কুকুরটি এখন সন্তানসম্ভবা। কালো কুকুরটিকে তিনি খুব মিস করছেন। তিনি অপেক্ষায় আছেন, কখন তার শাদা কুকুর সেই কালো কুকুরের বংশধরকে জন্ম দেবে!

ভার্গিজ তখনো জানেন না তার শাদা কুকুরের অনাগত সন্তানেরা কালো কুকুরের বংশধর নয়। জন্মের আদি খেলার রেশ ধরে তাদের বেশ হবে শাদা খয়েরি যা আমি থাকাকালীনই দেখে এসেছি।

মালয়শিয়া থেকে
islammn@yahoo.com

এস আলমে এক রাত

- স্বপ্ন কারিগর

২০০৩-এর জুন মাসের দিকের ঘটনা। প্রায়ই আমাকে বিভিন্ন কাজে চট্টগ্রাম যেতে হয়। সেদিন কাজ সেরে চট্টগ্রাম থেকে কুমিল্লা ফেরার জন্য ঢাকা-চট্টগ্রাম রুটের *এস আলম* সার্ভিস-এর টিকেট নিলাম এবং রওনা হলাম। আপনারা যারা চট্টগ্রামে থাকেন কিংবা আপনাদের চট্টগ্রামে আসা-যাওয়া আছে তারা হয়তো জানেন যে, চট্টগ্রামের মাদামবিবিরহাট, ফৌজদারহাট, সীতাকুণ্ডু ইত্যাদি এলাকায় জ্যাম কি জিনিস। একবার আটকালে সারাবেলা পার হয়ে গেলেও তা ছোটার নাম থাকে না।

বাসের কাউন্টারে যাওয়ার পর প্যাসেঞ্জার লাউঞ্জের দিকে হঠাৎ আমার চোখ আটকে গেল। একজন ঊনিশ বিশ বছরের একটি মেয়ে। সে এতোই আকর্ষণীয় ও সুন্দরী ছিল যে, তাকে দেখার পর তার প্রেমে পড়ে যাই। কতোক্ষণ ঠিক তার দিকে ড্যাব ড্যাব করে তাকিয়েছিলাম মনে নেই।

তবে আমার হুশ হলো কাউন্টার ম্যানেজারের ডাকে।

তিনি বলে উঠলেন, এই নিন আপনের টিকেট। আর দশ মিনিট পর গাড়ি ছাড়বো।

তখন টিকেট নিয়ে একটু সামনে গিয়ে মনে মনে ওই মেয়েটিকে নিয়ে সাতপাচ ভাবছিলাম আর একটু পর পর আড়চোখে তার দিকে তাকাচ্ছিলাম।

এতোক্ষণে মেয়েটি বোধহয় কিছুটা বুঝতে পেরেছিল।

সেখান থেকে সরে গিয়ে পাশের একটি দোকানে গিয়ে *আরসি*-র একটা ক্যান কিনে তা দিয়ে গলা ভেজাচ্ছিলাম। পরে বাসে উঠে আমার সিটটিতে বসার পর দেখি সে মেয়েটি আমার পাশের সিটটিতে বসছে। আমার বুঝতে আর বাকি রইলো না যে, সে আগেই সিটটি নিয়েছে।

এ কাকতালীয় ব্যাপারে আমি যতোটুকু না বিস্মিত হয়েছি তারচেয়ে বেশি খুশি হয়েছি। এ যেন মেঘ না চাইতে বৃষ্টি। পরক্ষণে আবার চিন্তিত হলাম তার সঙ্গে আর কেউ আছে কি না? পরে দেখি তার একজন আত্মীয় তাকে বাসে উঠিয়ে দিয়ে বাস না ছাড়া পর্যন্ত অপেক্ষা করছে। স্ট্যান্ড থেকে বাস ছেড়ে যাওয়ার সময় সে তার আত্মীয়টিকে হাত নেড়ে বিদায় জানালো।

বাস সময় মতো ছাড়লো। আমার সিটটি ছিল জানালার পাশে।

কিছুক্ষণ পর সে আমাকে বলে উঠলো, এক্সকিউজ মি, আপনি কি কাইন্ডলি আমার সিটে বসবেন? আমি জানালার কাছে বসতে চাচ্ছিলাম।

এক কথায় রাজি হয়ে গেলাম আর মনে মনে বলতে লাগলাম, আরে সিট কেন, তোমার জন্য দরকার হলে দুনিয়াই ছেড়ে দেবো।

তারপর সে আমাকে থ্যাংকস দিল আর বলতে লাগলো, বাসের মধ্যে অনেক সময় খারাপ লাগে ও মাঝে মাঝে বমির ভাব হয়। তাই জানালার কাছে বসলে সে ভয় থাকে না।

আমাদের সিটটি ছিল বাসের প্রায় পেছন দিকে তাই মোটামুটি ঝাকি খেতে খেতেই আমাদের গন্তব্যে পৌছাতে হয়।

সে আমাকে জিজ্ঞাসা করলো, আপনি কোথায় থাকেন, কি করেন, চট্টগ্রামে কি কাজ ইত্যাদি।

উত্তর দিলাম, আমার বাসা কুমিল্লা, ঢাকায় আইইউবি-তে কমপিউটার সায়েন্স-এ পড়ছি। সিক্সথ সেমিস্টার কমপ্লিট করলাম। পাশাপাশি একটা প্রাইভেট ফার্মে পার্টটাইম জব করছি। চট্টগ্রামে একটি প্রজেক্টের কাজে এসেছিলাম হাতে ছয় সাত দিন ছুটি থাকায় কুমিল্লা যাচ্ছি। আপনি?

আমার প্রশ্নে সে বললো, আমি চট্টগ্রাম মেডিকালে ফার্স্ট ইয়ারে পড়ি। ঢাকা মেডিকালে মাইগ্রেশনের চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু প্রশাসনিক কিছু বিধি–নিষেধ থাকায় আমাকে এখানেই পড়তে হচ্ছে। আমার বাসা ঢাকায়। আপনি ঢাকায় কোথায় থাকেন?

তার এই প্রশ্নের জবাবে বললাম, ইস্কাটনে থাকি। আপনি?

সে বললো, ধানমন্ডিতে।

তারপর অনেক কথা হতে লাগলো। আস্তে আস্তে আমাদের মধ্যে এ অল্প কিছুক্ষণে বেশ ভাব জমে গেল। এক পর্যায় বিভিন্ন রকমের কথা শুনতে শুনতে তার দিকে হা করে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকি।

যখন সে বুঝতে পারলো তখন সে আমাকে রসিকতার ছলে জিজ্ঞাসা করলো, কি ব্যাপার, আপনার কি হয়েছে, আপনি এভাবে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন কেন?

আমার ঘোর লাগা কাটলে উত্তর দিলাম *প্রেমে পড়ে গেছি*।

এ উত্তরে সে থতমত খেয়ে উঠলো এবং পরক্ষণে একটি মিষ্টি করে মুচকি হাসি দিল।

আমি তো তখন পুরোপুরি টাল হয়ে গেছে। আমার হার্ট বিট যেন বেড়ে গিয়েছিল একশ গুণ। মনে হচ্ছিল বাসের গতির সঙ্গে সঙ্গে আমার হার্টের গতি মাইলমিটারে যেন বাড়ছে আর বেড়েই চলছে।

নিজেকে কষ্টে সামলে নিলাম। তারপর আমিও ব্যাপারটাকে মানিয়ে নিতে হেসে উঠি। আবার ভাবতে থাকি, জীবনের এই তেইশ চব্বিশ বছরের ভেতরে যা কখনো করিনি বা আমার বেলায় হয়ে ওঠেনি তা কি না এভাবে! তাও এই হাইওয়েতে?

যাক, সবই উপরওয়ালার ইচ্ছা, সে চাইলে বান্দা তো করতে বাধ্য। এ বলে নিজেকে নিজে সান্তনা দিলাম।

হালকা মোটা লাগা দেহে হালকা আকাশী রঙের সালোয়ার কামিজে তাকে প্রথম দেখায় যে কেমন লাগছিল তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা অসম্ভব। তার গোলগাল মিষ্টি নিষ্পাপ চেহারা যেকোনো পুরুষের চোখ একবার হলেও আটকে দেবে। ফর্শা শরীর আর মিষ্টি চেহারা, ভারী নিতম্ব, স্ট্রেইট সিল্কি চুল... মায়াবী দুই চোখ। তার হালকা রঙের সুতির জামার ভেতরের সেমিজ ভেদ করে সাদা রঙের ব্রা–র উপস্থিতি স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। ব্রা–র ফিতাগুলো জামার মধ্যে কিছুটা হালকা করে ফুটে আছে। তার স্তন দুটি যেন দাড়িয়ে থাকা দুটি পর্বত। এক কথায় বলতে *সেক্সি*।

এসব কিছু দেখে আমি তার প্রেমে দিওয়ানা হয়ে গুন গুন করে গান গাইতে লাগলাম...

কেউ প্রেম করে কেউ প্রেমে পড়ে,

আমার হয়েছে কোনটা জানে না এই মনটা,

কেউ ভুল করে, কেউ ভুলে পড়ে

আমার হয়েছে কোনটা, জানে না এ মনটা।

কিছু দূর যাওয়ার পর বাস আটকে গেল জ্যামে। ওদিকে বিকেল গড়িয়ে প্রায় সন্ধ্যা আসছে। মনে মনে জ্যামকে ধন্যবাদ দিলাম।

তার মোবাইলে বাসা থেকে একটি কল এলো, সম্ভবত তার জন্য বাসার সবাই চিন্তা করছে কখন পৌছাবে। তখন সে আমাকে জিজ্ঞাসা করলো, এটা কোন জায়গা আর ঢাকা পৌছাতে কয়টা বাজতে পারে।

তখন বললাম, এটা ফৌজদারহাট। এখান থেকে ঢাকা পৌছাতে জ্যাম ছাড়তে কমপক্ষে চার পাচ ঘণ্টা লাগবে।

কারণ সেদিনটি ছিল বৃহস্পতিবার এবং তখন সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিল। তখন তাকে বললাম মেঘনা বৃজ পার হওয়ার পর বাসায় কল দিতে। তখন বাসা থেকে কেউ একজন গিয়ে বাস কাউন্টারে যাবে। সেখান থেকে তাকে নিয়ে যাবে।

আমার এই কথায় সে খুব খুশি হলো এবং বাসায় মোবাইলে ফোন করে বললো। ফোন রেখে সে আমাকে বললো, আপনি তো দেখছি প্রায় সব জায়গাই চেনেন।

তখন বাসের লাইট ছিল নেভানো, বাস চলছিল কখনো আস্তে, কখনো রাস্তা ফাকা পেলে জোরে। আবার জ্যামে আটকে গেলে দাড়িয়ে যায়, এভাবে চলছিল। কথা বলতে বলতে হঠাৎ তার হাত ইচ্ছাকৃতভাবেই হোক আর অনিচ্ছাকৃতভাবেই হোক এসে আমার উরুর সন্ধিস্থলে অর্থাৎ প্যান্টের জিপারের দিকে এসে পড়ে তখন আমার বিশেষ অঙ্গটি একেবারে উত্তপ্ত হয়ে যাচ্ছিল। ওদিকে আমার হার্ট বিট বেড়ে গিয়ে এমন লাগছিল যেন ভেতরে কেউ জোরে জোরে ড্রাম পেটাচ্ছে। মনে মনে চিন্তা করতে থাকি এটা কি হলো? এতো অল্প সময়ে কিছু না হতেই এতো দূর, নাকি অন্য কিছু!

নিজেকে সামলে আমিও একটু পরখ করার জন্য কিছুক্ষণ পর তার উরুতে হঠাৎ বেখেয়ালি ভান করে হাত রাখি। এর কিছুক্ষণ পর বাসের ঝাকিটাকে ইসু করে তার স্তনে হাতের বাহু দিয়ে ধাক্কা দিলাম এবং তার গায়ে গিয়ে পড়লাম। এমন একটা ভাব দেখালাম যেন আমি ভুলে দিয়েছি।

তার নীরবতাকে সম্মতি ধরে নিয়ে আমি চারপাশে দেখে তার শরীরের সঙ্গে নিজেকে প্রায় লাগিয়ে নিয়েছিলাম।

সেও আমার সঙ্গে গা ঘেষে বসলো। তখন সে আমার কানে কানে বলে উঠলো *এ কি করছো, কেউ যদি দেখে ফেলে।*

আমিও বললাম, অন্ধকারে কেউ কিছুই বুঝবে না।

তারপর আমার বাম হাত দিয়ে তাকে আবার বাহু বন্ধনে জড়িয়ে নিই। আমাদেরকে এতো অন্তরঙ্গভাবে বাসে কেউ দেখে মনে করবে যেন আমরা সদ্য বিবাহিত নতুন দম্পতি। অনেকে ততোক্ষণে বোধহয় মনে করতে শুরুও করে দিয়েছে। কারণ বাস যখন প্রায় ফেনীর কাছাকাছি চলে এসেছে তখন আমাদের ঠিক সামনের সিটে বসা একটা চাটগাইয়া দম্পতি ছিল। তারা শহরের শেষ কাউন্টার থেকে বাসে উঠেছিল। তাদের সঙ্গে ছিল দুই বছরের ছোট্ট একটি শিশু। তখন কি কারণে যেন শিশুটি কাদছিল।

তখন সে সামনের শিশুটিকে আদর করলো এবং কোলে ডাকতেই সে চলে আসে। সবচেয়ে অবাক কাণ্ড হলো, তার কোলে আসার পর শিশুটি একেবারে চুপ হয়ে গেল।

কিছুক্ষণ পর শিশুটির মা তার কাছ থেকে শিশুটিকে নিলেন এবং ধন্যবাদের সঙ্গে আরো বললেন, আপনারা নতুন বিয়ে করেছেন নাকি?

জানি না শিশুটির সঙ্গে আদর আহ্লাদের কারণে, নাকি দুজনকে এতো ঘনিষ্ঠভাবে দেখে তিনি এ উক্তি করলেন। এতে আমি তখন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যাই।

সে চটপট মাথা নেড়ে হ্যা সূচক উত্তর দিল।

পরে কিছুটা শুনতে পেলাম যা ছিল এ রকম যে, মহিলাটি তার স্বামীকে বলছে, পেছনের সিটের এই যুগলকে খুব ভালো মানিয়েছে না?

তার স্বামীও তার সঙ্গে হ্যা বললেন আরো বললেন, খুবই ভালো মনের মানুষ বটে। তাদের কথোপকথন ছিল চট্টগ্রাম ও নোয়াখালীর খানিকটা আঞ্চলিক ভাষা মিশ্রিত।

এরই মাঝে কখন যে আমার দুষ্ট হাতটি তার স্তন নিয়ে খেলা শুরু করে দিয়েছিল তা আমিও বুঝতে পারিনি। পরক্ষণেই নিজেকে নিজে মনে মনে বলি, এ কি করছি! আমি যে কাজের ধারে কাছেও কখনো যাইনি সেটা কি না আজকে এভাবে, তাও কারো সঙ্গে প্রথম দেখার শুরুতে ...?

আমি তখন পুরোপুরি ঘোরের মধ্যে। পরে শুনতে পেলাম কে যেন আমাকে বলছে, *সুযোগ সব সময় আসে না, কাজে লাগাও!*

আমার মাথাটা ঝিম ধরে আসছিল আমার ভেতরে যেন আরেক আমি বলছি, না! যতো কিছুই হোক তাকে কোনো অবস্থাতেই অপবিত্র হতে দেবো না সেটা আমার হাতেই হোক আর যাই হোক...।

এ নিয়ে ভাবছিলাম এবং সেখান থেকে হাত সরিয়ে স্থির হলাম।

তারপর সময় যে কিভাবে যাচ্ছিল তা আমার মনে নেই। শুধু এটুকু মনে করতে পারি যে, বাসের গতির সঙ্গে সঙ্গে আমিও গতিময় বাস্তব কিংবা স্বপ্নের সিড়িতে কিছু সময় ছিলাম।

বাস ঢাকা–চট্টগ্রাম হাইওয়েতে *মিঞাবাজার* নামের একটি জায়গাতে *কানন* নামের একটি অভিজাত স্পর্টে পচিশ মিনিটের যাত্রা বিরতি দিল।

তখন আমরা বাস থেকে নেমে এলাম, কানন–এ পরিবেশটা বেশ খোলামেলা আর পরিপাটি করে সাজানো–গোছানো, বাইরেও বসার ব্যবস্থা আছে। বলতে গেলে রোমান্টিক পরিবেশ।

তাকে খাওয়াতে চাইলাম। কিন্তু সে কিছু খেতে চাইলো না। তারপর বহু কষ্টে তাকে অনেক জোরাজুরি করে একটি *ইউরো লেমন* দিলাম। পরে বললাম, আমি তো একটু সামনে কুমিল্লা বিশ্ব রোডে নেমে যাবো, তোমার সঙ্গে কি আমার আর দেখা হবে না?

আমি আরো কিছু বলার আগেই সে বলে ফেললো, আপনি কি সত্যিই আমার প্রেমে পড়ে গেছেন?

বললাম, কেন সন্দেহ আছে নাকি?

ঠিক আছে, তাহলে তুমি আমার সঙ্গে ঢাকা চলো। যেহেতু আমি একা, তুমি আমাকে ঢাকা নিয়ে যাও।

অজানা উত্তেজনায় ও টেনশনে আমাকে তখন একবার আপনি আবার তুমি সম্বোধনে আমি মজাই পেয়েছিলাম। নিশ্চিত হয়েছিলাম যে, তারও ইতিমধ্যে মনে তোলপাড় শুরু হয়ে গিয়েছে। পরিস্থিতি তো তাই বলছে বলে আমার ধারণা।

সে বললো, কি পারবে?

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি রাত সাড়ে আটটা বাজছে। কোনো রকম আগ–পিছ চিন্তা না করে আমিও তাকে বলি, ঠিক আছে, আমিও যাবো।

আমার এ কথায় সে তো রীতিমতো টাসকি খেলো! এবং খুশিও হলো। কারণ সে হয়তো ভেবেছিল আমি বোধহয় যেতে চাইবো না। এই চান্সে সে আমার সততাও পরীক্ষা করলো। ওদিকে বাসায় আম্মাকে মোবাইলে কল করে বললাম, আমার আসতে অনেক রাত হবে। রাস্তায় ভীষণ জ্যাম। এ বলে বাসায় আম্মা ও আব্বাকে ম্যানেজ করলাম।

তারপর আমিও ঢাকার দিকে রওনা হলাম।

ওদিকে সে তার মোবাইল থেকে কাকে যেন একটা মেসেজ পাঠালো। এবার পথে অনেক ধরনের কথা চললো।

এক সময় আমরা ঢাকায় এসে পৌছাই। তখন বাজে রাত সোয়া দশটা। তখন কমলাপুরে এস আলম কাউন্টারে এসে থামলে বাস থেকে নেমে দেখি তার বাবা ও ছোট ভাই তাকে নেয়ার জন্য অপেক্ষা করছেন।

তখন সে আমাকে নিয়ে তার বাবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয় এবং আমার মোবাইল নাম্বার নিয়ে যায়।

মজার ব্যাপার হলো, এতো কিছুর ভেতরে আমি তার মোবাইল নাম্বার বা ফোন নাম্বার নিতে ভুলে গিয়েছিলাম।

পরে আমি সায়েদাবাদ গিয়ে কুমিল্লার *তিশা সার্ভিস*–এ করে কুমিল্লায় রওনা হলাম। পথে চিন্তা করলাম কার জন্য, কেন এলাম? কি লাভ হলো আমার? নারীর মোহ যে কি জিনিস তা ধরা না খেলে বোঝা অসম্ভব। তাই মনে মনে গুন গুন করে গান ধরলাম :

তোমার ভাজ খোল আর আনন্দ দেখাও

করি প্রেমের তরজমা।

তার দুই তিন দিন পর হঠাৎ একদিন সকালে এগারোটায় আমার মোবাইলে একটি কল এসেছিল, তখন আমি ঘুমিয়ে থাকায় আমার আম্মা আমার রুমে এসে রিসিভ করেন এবং নারী কণ্ঠ শুনে যতোটুকু থমকে যান তারচেয়ে বেশি আনন্দিতও হয়েছেন বটে। কারণ আমি ছিলাম সবচেয়ে শান্তশিষ্ট ও সরল-সোজা টাইপের। মানে কোনো মেয়ের সামনে গেলে কথা আটকে যেতো...! তাই এ ধরনের কল আমার কাছে অপ্রত্যাশিত ছিল কিন্তু এই কল আসার পর আম্মা আমার সম্পর্কে কিছুটা ধারণা বদলে ফেলেন। অন্তত এই বলে হাপ ছেড়ে বাচেন যে, যাক, তাহলে ছেলের কিছুটা উন্নতি হয়েছে।

পরে জানতে পারলাম, আমার আম্মা রীতিমতো মেয়েটির সমস্ত খবরাখবর কথা বলে বের করে ফেলেছেন। আমার ছোট বোনের মারফতে জানতে পারলাম, আম্মা আমার সব কিসসা-কাহিনী জেনে গেছেন।

ওদিকে চিন্তা কররছিলাম কি রকম মেয়েরে বাবা! একেবারে সব কিছু বলে দিল? এই বুদ্ধি নিয়ে ডাক্তারি পড়ে কিভাবে? নাকি অন্য রকম কোনো প্ল্যান করছে। কিভাবে সেই সব কিছু বলে দিল।

পরে আরো জানলাম যে, সে শুধু আমার আম্মার কাছেই নয়, সে তার বাসায় সবার কাছে আমার কথা বলেছে।

মাত্র কয়েক ঘণ্টায় যে এতো বড় একটা ঘটনায় মোড় নেবে তা আমার বিশ্বাস হচ্ছিল না।

সবচেয়ে বেশি অবাক হয়েছি, সে কিভাবে তার বাসায় সবাইকে সেদিন ফিট করেছিল তা সত্যিই আমার কাছে এখনো স্বপ্নের মতো। এ কি ইন্দ্রজাল নাকি! তবে এর কিছুটা জেনেছি, বাকিটা আর জানতে চাইনি। অন্তত এটুকু জানি যে,সে আমাকে ভীষণ ভালোবাসে। জানতে পেরেছি, আমার সরলতা তাকে খুব গভীরভাবে আকৃষ্ট করেছে, আরো জেনেছি যে, মাস খানেক আগে তার বাবা এ ধরনের একটি প্ল্যান করেন তাদের মেয়ের জন্য সু পাত্র নির্বাচন করার জন্য। তাছাড়া আমার দায়িত্বজ্ঞান, মানে রাতে একটি মেয়েকে একা না ফেলে গন্তব্যে পৌছে দেয়া বর্তমানে প্রায় অসম্ভব। তাই এক পর্যায়ে সে সিদ্ধান্ত নেয় এবং তা ঢাকায় বাসায় ফিরে বাবা, মাকে জানায়।

তার বাবা ছিলেন সেনাবাহিনীর সদ্য অবসরপ্রাপ্ত মেজর। তার কথায় তার বাবা মাসহ সবাই আমাকে তার জন্য পছন্দ করলেন। আমার এটুকু অজানা ছিল যে, তারা আমার আম্মা ও আব্বার সঙ্গে এ নিয়ে কথাও বলেছেন। তবে শর্ত হলো, তার-আমার গ্র্যাজুয়েশন শেষ হলে আমাদের *আকদ* করিয়ে দেবেন।

এখন পর্যন্ত এ কথাই আছে।

আমাদের মধ্যে যোগাযোগের দশা হলো প্রতিদিন গড়ে নিম্নে পাচ থেকে সর্বোচ্চ পয়ত্রিশবার তাকে কল দিই। খালি একটা মিসকল পেলেই হলো, সঙ্গে সঙ্গে কল ব্যাক। আমাদের প্রণয় এখন চলছে দুর্বার গতিতে। তবে লাইসেন্স থাকায় কোনো ভয় নেই।

সকলের প্রতি আমার একটা আর্জি, আর যাই করুন অন্তত সারা জীবনের একটি ব্যাপার...। এখানে বুঝে-সুঝে সঙ্গী বেছে নিন। তা অবশ্যই বাবা মায়ের সম্মতিসহ। কারণ বাবা মায়ের দোয়া ছাড়া কোনো সন্তানই জীবনে উন্নতি করতে পারে না এবং সুখীও হতে পারে না। নিজের পছন্দকে বাবা মায়ের কাছে বলুন, আমার বিশ্বাস তারা অবশ্যই না করবেন না।

কুমিল্লা থেকে

আত্মকাহিনী

– দীপ্তি

কোনো বিষয়ে তেমন কোনো আগ্রহ আমার ছিল না। আত্মকেন্দ্রিক স্বভাবের মেয়ে আমি। তাই সহজে কেউ বুঝতে পারে না আমার মনের গতিধারা। খুব সহজেই বাস্তবতাকে মেনে নেয়াই আমার নীতি। কারো সঙ্গে

আমার দুঃখময় ঘটনাগুলো ভাগাভাগি করতে পারি না। এটা যে কতো বড় কষ্ট তা বলে বোঝাতে পারবো না। অথচ আমার বোন সম্পূর্ণ আলাদা। তার সব কথা আমাকে না বলে থাকতেই পারে না। যতোক্ষণ আমার কাছে না বলে ততোক্ষণ মনে হয় তার দম আটকে থাকে।

তাকে খুব ভালোবাসি। তার গতিধারা অস্থিতিশীল, আজ এটা ভালো তো কাল অন্যটা। অবশ্য ভালোবাসার ব্যাপারে একটা শেষ না হওয়া পর্যন্ত অন্য কোনোদিকে তাকাবে না। কিন্তু বার বার তার জীবনে ঘটছে উইকেট পতনের ঘটনা। আমার খুব কষ্ট হয় যখন দেখি মন খারাপ করে বসে থাকে। বন্ধুটির সঙ্গে মিসকলে কথা হয় না। অবশ্য আমার বোনটিকে তো অন্য দশজন থেকে বেশি জানি। তার স্বভাব হলো বেশি আলোচনা সমালোচনা করা। এক কাপ চা বানাতে গেলেও দেখা যায় বার বার বলছে, চিনি, চা পাতা কম হয়েছে, নাকি দুধ বেশি হয়েছে ইত্যাদি। কিছু জানতে চাওয়ার আগেই সব বলে দেয়। কাজেই কোনো প্রশ্ন করার সুযোগ আমার থাকে না।

আমার বেলায় সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম খুচিয়ে খুচিয়ে কোনো কথা বের করা যাবে না। মচকানো বা ভেঙে পড়া কোনোটাই আমার মধ্যে পরিলক্ষিত হয় না। সব কিছু হাসি মুখে হালকা করাটা আমার প্রধান কাজ। জীবনে একবারই *ভালোবাসা* নামের শব্দটার মাধ্যমে পটপরিবর্তন করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু বিধি বাম।

স্বপ্ন স্বপ্নই। স্বপ্ন দেখতে কে না ভালোবাসে? সেই ভালোবাসার স্বপ্ন আমাকে একজন দেখিয়েছিল। দীর্ঘ সাড়ে তিন বছরের সম্পর্কের মাঝে ছিল কতো আনন্দময় স্মৃতি। স্মৃতির পাতায় নিজের অজান্তে মাঝে মধ্যে হারিয়ে যাই। অবশ্য ফিরে আসতে সময় লাগে না। নিজের অজান্তেই হঠাৎ দেখি আমার সুন্দর সাজানো স্বপ্নগুলোকে ভেঙে চুরমার করে দিল প্রলয়ংকরী এক ঝড়। ঝড়ের দমকা বাতাসে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল আমার স্বপ্নীল মনটা। ধ্বংস হয়ে গেল ক্ষণিকে সব আশার আলো।

বার বার জানতে ইচ্ছা করে, কি আমার অপরাধ? যার শাস্তি বিনা প্রতিবাদে মাথা পেতে নিতে হলো আমাকে। জানি এ প্রশ্নের কোনো উত্তর দিতে পারবে না আমার সবচেয়ে প্রিয় বন্ধুটি। বন্ধু বন্ধুই রয়ে যাবে। কেবল ভালোবাসার পর্বটা অতীত স্মৃতি হয়ে বিরাজ করবে আমার অস্তিত্বে।

একটা সময় ছিল যখন দীর্ঘক্ষণ চলতো ফোনে আমাদের কথা বলা এবং এখন মনে হয় ফোনটা রাখতে পারলেই বাচি। সময়ের ব্যবধানে চলে এসেছি তার কাছ থেকে দূরে বহু দূরে। তার একটাই কথা, শেষ পর্যন্ত তুমিও আমাকে বুঝতে চাইলে না, একবারও অনুভব করলে না আমার হৃদয়ে অসহনীয় যন্ত্রণা আর না বলা কষ্টগুলো। আমার একমাত্র বন্ধু হিসেবে ভেবেছি, সব কিছু তোমাকে বলবো, তোমাকে বলার মতো কোনো সময় ও সুযোগ আমাকে দিলে না।

আমি বলবো, আমাদের পথ আলাদা। বলার মতো সময় সুযোগ দুই-ই ছিল, ছিল না বলার মতো সৎ সাহস। কাজেই তোমার ভালোবাসার ভীত যে কতোটা নড়বড়ে সেটা বুঝতে বাকি নেই। স্বপ্ন তুমি দেখিয়েছো, তুমি ভেঙেছো। বিবেক নামের বস্তুটি তোমার মাঝে থেকে থাকলে নীরবে সেটা তোমাকে তাড়া করবে, আমি সেখানে অন্ধ দর্শকের ভূমিকা পালন করবো।

সব সময় নিরাপদ দূরত্বে চলতে চেষ্টা করেছি। তাই নিজেকে সহজে সামলাতে পেরেছি। দুঃখ একটাই, আমাদের সম্পর্কের কথা আমার আশি শতাংশ আত্মীয়, বন্ধু-বান্ধব জানতো। এতোগুলো মানুষের কাছে আমাকে ছোট করলে! এর শাস্তি তোমার প্রাপ্য। আমি কতো বোকা। তা না হলে নিজের প্রেমের কথা সবাইকে জানাই! অবশ্য গ্যারান্টি পেয়েছিলাম বলেই বোকামি করতে পেরেছি। এটাও তো জীবনের একটা অভিনব শিক্ষা।

পুরুষ জাতির প্রতি দীর্ঘ দিনের যে বিশ্বাস তুমি সৃষ্টি করেছিলে আমাকে দিয়ে তার পরিসমাপ্তি এতো নিষ্ঠুর হবে আশা করিনি। তোমার ভাইবোনদের সামনে আমাকে উপস্থাপন করার আগে একটিবারও ভবিষ্যতের কথা ভাবলে না। কেবল বর্তমান দেখলে চলে না, অতীত ও ভবিষ্যতের চিন্তাও করতে হয়। কথাটা মনে রেখো।

আমার কাছ থেকে এখনো অভিশাপ নয়, আশীর্বাদই পাবে। কেননা এটা ছিল আমাদের অতীত দিনের মূলমন্ত্র। তোমার জন্য এতোটা সময় নষ্ট না করলে এতো দিনে আমার জীবনের প্রেক্ষাপট পাল্টে যেতো। তাছাড়া তোমার বন্ধুদের ধারণা, সঠিক সময়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারিনি। অবশ্য এর যৌক্তিকতাও রয়েছে। আমার ধারণা, ভুল করে ভুল মানুষটিকে ভালোবেসে হৃদয়ের গহীনে স্থান দিয়েছিলাম বলে ভুল বুঝে আমাকে ভুল সিদ্ধান্তে পৌছে দিল।

অবশ্য এতোগুলো ভুলের ভার একা আমাকেই বইতে হবে। এতে আমার কোনো দুঃখ নেই। সবাই জানে, তোমাকে ছেড়ে এসেছি। আসলটা কি সেটা তুমি জানো। আমার সারা অস্তিত্ব জুড়ে ছিল যার বসবাস, সময়ের স্রোতে দূরে বহু দূরে তার বাস। এটাই সত্য। ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস!

নান্দলা, কিশোরগঞ্জ থেকে

প্রতিবেশী

– মাউদুদা খাতুন

অ্যাকসিডেন্টের খবর শুনে গভীর রাতে আমরা যখন আহতদের উদ্দেশে রওনা হলাম তখন সারা পাড়া অঘোরে ঘুমাচ্ছে। প্রতিবেশীদের কোনো সাড়া নেই, শব্দ নেই। আমাদের বলা কথায় আমাদের কানে তীব্রভাবে বাজছে। পাশে বাচ্চা ঘুমিয়ে থাকলে মা যেমন বাচ্চার ঘুমের ব্যাঘাত না করে চুপিচুপি তার কাজ সারে, আমরাও তেমনিভাবে বের হলাম কাউকে না জাগিয়ে, কাউকেই কিছু না বলে।

কিন্তু আমরা রওনা হওয়ার পর পরই সারা পাড়া জেগে উঠেছে। তারা জেনে গেছে অ্যাকসিডেন্টের কথা। শীতের রাত উপেক্ষা করে, লেপের ওম ছেড়ে তারা ছুটেছে হাসপাতালে যেখানে আহতরা ভর্তি।

বাস ভর্তি লোক গিয়ে হাসপাতালে আহতদের রক্ত দেয়ার জন্য নিজেরা নিজের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। তারা জানে না আহতদের সঙ্গে তাদের রক্তের গ্রুপ মিলবে কি না। তারা শুধু জানে কারো না কারোর সঙ্গে মিলবেই মিলবে। তাই তারা এক একজন ব্লাড ব্যাংক হিসেবে মৃত্যু পথযাত্রীদের রক্ত দিয়ে জীবন বাচিয়ে রাখতে সাহায্য করেছে। এটা শুধু বিস্ময়কর নয়, অভাবনীয়–অচিন্তনীয়।

আমার প্রতিবেশীরা কেউ কেউ সেদিন নিজের ঘরে রান্না করেনি। ওই দিনের আমন্ত্রিত অতিথিদের তারা আমন্ত্রণ ফিরিয়ে নিয়েছে। পাড়ার মহিলারা মুসলিম শরিয়ত অনুযায়ী আমার প্রয়াত মেয়ের পর্দা রক্ষা করেছে। কেউ কেউ আমাদের বাড়িতে আসা অসংখ্য আত্মীয়স্বজনকে রান্না করে খাবার পাঠিয়েছে। কেউ বা আমাদের বাসায় আসার আগে কাফনের কাপড়টিও কিনে রেখেছে যাতে হতবাক আমাদেরকে কোনো রকম পেরেশানিতে পড়তে না হয়। কেউ কেউ আবার আমার প্রয়াত মেয়ের জন্য দোয়া–দরুদও পড়েছে।

প্রতিবেশীরা যে কি ধরনের বিস্ময়কর ভালোবাসা দেখিয়েছে তা বুঝিয়ে বলার নয়, প্রকাশের ভাষা নেই। তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করাও যেখানে দীনতা বলে আমার কাছে মনে হয় সেখানে কেবল অনুভব করি, হৃদয়ে দিয়ে অনুভব করি প্রতিবেশীদের ভালোবাসা। তাই একাকী নীরবে তাদের শ্রদ্ধা জানাই, তাদের প্রতি নীরব কৃতজ্ঞতায় আমার চোখ পানিতে ভরে যায়, আল্লাহপাকের কাছে তাদের মঙ্গলের জন্য সর্বান্তকরণে দোয়া করি।

তবে দুঃখ একটা থেকেই যায়। এ রকম প্রতিবেশী থাকা সত্ত্বে আমার জেমী মা অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে রক্ত শূন্য হয়ে চলে গেল। আমার জেমী মা প্রতিবেশীদের এ ভালোবাসা সম্বন্ধে কিছুই জানতে পারলো না, হয়তো কোনোদিনই জানতে পারবেও না।

মোবাইল ফ্রেন্ড

– লিমন

১৫ এপৃল ২০০৩–এ অফিসে মনোযোগসহ কাজে ব্যস্ত। এমন সময় মোবাইলে রিং বেজে উঠলো। মিসকল এবং মিসকল।

রিং ব্যাক করলাম। মহিলা কণ্ঠ।

হ্যালো, কমলভাই।

বললাম, আপনি বারে বারে মিসকল দিচ্ছেন কেন? আমার সাত টাকা খরচ করলেন।

উত্তরে বললেন, আপনি এতো কঞ্জুস কেন?

বললাম, মোবাইলে টাকাটা কমে গেল আর কঞ্জুস হলাম!

মোবাইলের লাইনটা কেটে দিলাম। ওই দিনই আবার মিসকল।

আবার রিং ব্যাক করলাম।

এবার ধমক না দিয়ে পরিচয় জানতে চাইলাম।

নাম না বলে এলাকা, ভাইবোন ইত্যাদি বললেন।

আমার পরিচয় দিলাম।

আমাদের এভাবেই মোবাইল আলাপ শুরু। প্রতিদিন মোবাইলে কথা হয় ঘন্টার পর ঘন্টা। আলাপের কোনো সীমারেখা নেই। তার চুল থেকে শুরু করে বিভিন্ন অঙ্গের বিবরণে আকৃষ্ট হতাম।

তাকে দেখার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলাম। প্রায় চার মাস পর লাবনীর সঙ্গে দেখা করার দিন। ওর ভাইয়ের কলিগের বাসায় আমাদের দেখা হবে।

সেই মোতাবেক রাজশাহী থেকে বি–বাড়িয়ার পথে পা বাড়াই। আগেই আমাদের ডিপার্টমেন্টের আইবি (ইনসপেকশন বাংলো)–তে একটি রুমের ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল। সেখানেই উঠলাম দুপুরের সময়।

বিকেলে একটি রিকশা নিলাম ঘন্টা অনুযায়ী। ছোট্ট শহর। ঘুরে ঘুরে দেখলাম গ্যাস ফিল্ড, কালভৈরব (বিশাল মূর্তি), তিতাস নদী।

রাতে অনেক কথা হলো।

লাবনী বলছিল, হায়, তুমি এতো কাছে, অথচ দেখতে পাচ্ছি না।

রাতে ভালো ঘুম হলো না।

অবশেষে পরদিন সকাল দশটায় ওর ভাইয়ের কলিগের বাসায় পৌছালাম।

কিছুক্ষণ পর লাবনী তার বান্ধবীকে নিয়ে হাজির।

চোখ ভরে দেখলাম এবং মোবাইল আলাপের সঙ্গে মেলাতে থাকলাম। কয়েক ঘন্টা বিভিন্ন আলাপ নিয়ে আমাদের সময়টা দ্রুত কেটে গেল।

লাবনী অনেক রকম রান্না করে নিয়ে এসেছিল।

সেগুলো পেট পুরে খেলাম।

বিকেলের ট্রেনে ঢাকায় পৌছালাম।

লাবনী কিছু দিন পরেই ঢাকায় বদরুননেসা মহিলা কলেজে মাস্টার্সে ভর্তি হলো।

যেদিন হস্টেলে প্রথম উঠলো ওই দিন ওকে অনেক সময় দিয়েছি। এক সঙ্গে রিকশায় ঘুরেছি, খেয়েছি।

আমাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা এতো বেড়ে গেল যে, প্রতিদিন প্রতি ঘন্টায় কথা না বললে ভালো লাগে না।

২০০৪–এ ফ্রেন্ড ডে এবং লাবনীর জন্মদিন উপলক্ষে ঢাকায় গেলাম। রিকশা, সিএনজিতে ঘুরলাম। আদর দিলাম, পেলাম। চুমু দিলাম, পেলাম।

লাবনীর কোমর চেপে ধরে লালবাগ কেল্লায় হাটলাম। ওর স্তনে হালকা স্পর্শ করেছি দুই একবার।

আমি বিবাহিত কথাটা আগেই জানিয়েছিলাম এবং আমাদের এভাবে আর অগ্রসর হওয়াটা ঠিক হবে না। কিন্তু কে শোনে কার কথা।

অবশেষে অবস্থা বেগতিক দেখে মোবাইলের সিমটা পরিবর্তন করলাম। তিন দিন পর নিজেই ঠিক থাকতে না পেরে কল করলাম।

ওপার থেকে কান্না। তুমি এভাবে পারলে?

চলতে থাকলো আবার মোবাইল সংলাপ।

বেশ কিছু দিন এভাবে চলার পর আমার সন্তান আসছে এসব চিন্তা করে আমার মোবাইলের সিমটা আবার পরিবর্তন করি। প্রতিজ্ঞা করলাম, যতোই কষ্ট হোক, আর না। সাত দিন এভাবে থাকার পর লাবনীর চিঠি পেলাম। চিঠিটি হুবহু তুলে দিলাম :

লিমন,

শুভেচ্ছা নিও। আশা করি ভালো আছো। আর তোমার তো ভালো থাকারই কথা। তোমার তো সবই আছে। আমার মতো হতভাগিনীর কথা কি করে যে ভুলে গেলে জানি না। আমার যদি কোনো ভুল হয়ে থাকে তাহলে দুহাত জোড় করে ক্ষমা চাচ্ছি, ক্ষমা করে দিও। আমার শরীরটা+মনটা অনেক খারাপ। যদি পারো এক মিনিটের জন্য হলেও ফোন করো। সারাক্ষণ শুধু তোমার একটা ফোনের অপেক্ষায় প্রহর গুণি কখন তোমার ফোন নাম্বারটি আমার চোখের সামনে ভেসে উঠবে। তখন হয়তো বিধাতার কাছে আমার আর কিছুই চাওয়ার থাকবে না। তুমি কেন আমাকে ভুল বুঝলে? কেন আমার কাছ থেকে দূরে চলে গেলে? সারাক্ষণ শুধু এসব নিয়েই ভাবি। জানি না এ ভাবনার অবসান কখন ঘটাবে। প্লিজ, আমাকে তুমি ভুল বুঝো না।

ইতি

তোমার হতভাগিনী

লাবনী

চিঠিটা পাওয়ার পর নিজেকে ঠিক রাখতে না পেরে আবার ফোন করলাম। শুরু হলো আবার মোবাইল আলাপ।

এখন আমার মাঝে মধ্যেই ঢাকা আসা হয়। ওকে নিয়ে ইচ্ছামতো যেখানে খুশি, যেভাবে খুশি চষে বেড়াই। জানি না এর শেষ কোথায়!

শিরোইল, রাজশাহী থেকে

হেমা ভাবী

– এম. হাবিবুর রহমান মিজান

ছোটকাল থেকেই মামার বাড়িতে থেকে লেখাপড়া করতাম। মায়ের চাচাতো বোনের মেয়ে প্রিয়ায়ও মামার বাড়িতে থেকে লেখাপড়া করতো। প্রিয়ার মামাদের সঙ্গে আমার মামাদের জমি–জমা সংক্রান্ত ব্যাপার নিয়ে দীর্ঘ দিনের *দা–কুমড়া* সম্পর্ক। সে জন্য ছোটকাল থেকেই আমরা প্রিয়ার মামাদের পরিবারের কারোর সঙ্গে মিশতাম না, কথা বলতাম না।

প্রিয়া ছিল খুবই সুন্দরী। প্রথম নজরেই যেকোনো পুরুষ তার রূপে মুগ্ধ হতো। চঞ্চল হরিণীর মতো টানা টানা চোখ, কমলার কোয়ার মতো গোলাপি ঠোট। সব মিলিয়ে পুতুলের মতো চেহারা।

প্রিয়া আর আমি একই বাড়িতে বাস করতাম বটে কিন্তু কোনোদিন কথা হয়নি। চলার পথে মাঝে মধ্যে দেখা হতো। দুই পরিবারের কড়া সতর্ক বাণীর কারণে উভয়ই নীরব থাকতাম।

প্রিয়াকে আমার খুব ভালো লাগতো। কিন্তু কোনোদিন তাকে বুঝতে দিইনি।

কিছুদিন হলো মামাদের পাশের ঘরের হিমেলভাইয়া বিয়ে করেছে। ভাবী এতোই সুন্দরী ছিলেন, দেখতে অবিকল হিন্দি ফিল্ম–এর নায়িকা হেমা মালিনির মতো। সে জন্য আমরা সবাই তাকে হেমাভাবী বলেই ডাকতাম।

অল্প কিছুদিনের মধ্যে হেমাভাবী তার মিষ্টি ব্যবহারের গুণে আমাদের সবাইকে আপন করে নিলেন।

সুযোগ বুঝে একদিন ভাবীকে আমার মনের কথা জানালাম।

ভাবী তার স্বভাব অনুযায়ী মুখে গোলাপি হাসি ফুটিয়ে বললেন, এই বুঝি কথা! তাহলে শেষ পর্যন্ত দুই আসামিই আমার হাতে ধরা পড়লো।

ভাবীর কথা শুনে কিছুটা লজ্জিত এবং অবাক হলাম। তাহলে কি প্রিয়াও এতোদিন দূর থেকে আমাকে ভালোবেসেছে?

ভাবীর বদৌলতে একদিন গভীর রাতে আমার আর প্রিয়ার একান্তভাবে সাক্ষাৎ হলো। দীর্ঘ দিন মনের মাঝে লুকিয়ে রাখা দুজনের না বলা কথা জানাজানি হলো।

তারপর থেকে সপ্তাহে একদিন ভাবীর সাহায্যে প্রিয়ার সঙ্গে মিলিত হওয়ার সুযোগ হতো। আর মাঝে মধ্যে ভাবীর মাধ্যমে চিঠি লেনদেন হতো। ব্যাপারটা ভাবীর অনুরোধেই আমাদের তিনজনের মাঝে সীমাবদ্ধ ছিল।

ভাবী আমাদের দুজনকেই পরামর্শ দিলেন, আমরা যেন আপাতত চলার পথে কিংবা আড়ালে কেউ কারো সঙ্গে কথা না বলি অথবা ইশারা–ইঙ্গিতে কোনো ভাব বিনিময় না করি। তাহলে দুই পরিবারের মধ্যে বড় ধরনের ঝগড়া শুরু হয়ে যেতে পারে। ভাবী আশ্বাস দিলেন, সময় মতো ব্যাপারটা তিনিই দুই পরিবারকে জানাবেন।

সামনে প্রিয়ার এসএসসি পরীক্ষা। সে জন্য ইদানীং চিঠি কিংবা দেখা–সাক্ষাৎ একদম কমিয়ে দিয়েছে। তার উপর ভাবীর ছোট ননদ বেড়াতে আসায় প্রায় এক মাসের মতো প্রিয়ার সঙ্গে দেখা করার সুযোগ হয় না।

প্রিয়ার সঙ্গে দেখা করার সুযোগ করে দেয়ার জন্য ভাবীকে বার বার রিকোয়েস্ট করায় ভাবী তার রহস্য মাখা হাসি দিয়ে বলেন, সামান্য কয়েকদিনেই এতো অধৈর্য হলে চলবে কেমন করে? কথায় বলে, মনের মানুষের বিরহ যতো গভীর হয়, ভালোবাসা ততো গাঢ় হয়।

ভাবী জানালেন, আগামী তিন চার দিন পরই ভালোবাসা দিবস, সেদিন যেভাবেই হোক আমার আর প্রিয়ার দেখা করার ব্যবস্থা করে দেবেন। এর মাঝে তার ননদও চলে যাবে।

পরদিন ১৪ ফেব্রুয়ারি। খুশি আর উত্তেজনায় অনেক রাতে ঘুমালাম।

সকাল আটটার দিকে হিমেলভাইয়ার ডাকে ঘুম ভাঙলো। হিমেলভাইয়াকে দেখে তো আমার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়লো।

বললাম, ভাইয়া, আপনি না এক সপ্তাহ আগে ছুটি কাটিয়ে গেলেন?

ভাইয়া বললেন, হঠাৎ তোর ভাবীর কথা মনে পড়ে গেল। তাই অফিস থেকে তিন দিনের ছুটি নিয়ে চলে এলাম।

ভাইয়া আমাকে নাশতা খাওয়ার জন্য টেনেহেচড়ে তার বাসায় নিয়ে গেলেন। ভাবী আমাকে দেখে মিটি মিটি হাসছেন।

ভাইয়ার পেছন থেকে ভাবীকে দিলাম এক ভেংচি।

আজকের এমন সুন্দর প্রোগ্রামটি মাটি করার কারণে ভেতরে ভেতরে হিমেলভাইয়ার ওপর ভীষণ ক্ষেপে আছি।

ভাবী এটা বুঝতে পেরে নাশতার টেবিলে সুযোগ বুঝে হাসি হাসি মুখে আমাকে বললেন, মাত্র তো তিনটা দিনই। এর জন্য বুঝি এতো মন খারাপ করতে হয়!

মুখে বললাম, না না! এ আর এমন কি! মনে মনে তার স্বামীর চৌদ্দগোষ্ঠি...।

হিমেলভাইয়া ছুটিতে বাড়ি আসায় ভাবী তো মহা খুশি। দিনের মধ্যে যতোবার ভাবীকে দেখেছি, মনে হয় তার মুখের হাসিই ফুরায় না।

মামাদের বাড়ি থেকে কোয়ার্টার মাইল দূরে নতুন ইলেকট্রিক পাওয়ার হাউস বসানো হয়েছে। হাজার পাওয়ারের চারটি বাল্ব পুরা রাত চার দিকে আলোকিত করে রাখে। গ্রামে নতুন পল্লি বিদ্যুতের লাইন আসাতে এলাকার সবাই খুশি।

সন্ধ্যার পর এলাকার জওয়ান-বুড়ো সবায় আলোর দৃশ্য দেখার জন্য পাওয়ার হাউসের কাছে ভিড় জমাতো। তেমনি ১৪ ফেব্রুয়ারি রাত প্রায় সাড়ে এগারোটায় হিমেলভাইয়া আর ভাবী চুপি চুপি পাওয়ার হাউসের আলোর দৃশ্য দেখার জন্য গিয়েছিলেন।

বাংলা ঘরের জানালা দিয়ে তাদেরকে দেখে মাথায় এক দুষ্টুমি বুদ্ধি এলো। দৌড়ে বাড়ির ভেতরে ঢুকলাম। পুরো বাড়ি অন্ধকার। শুধু প্রিয়ার পড়ার রুমে হারিকেনের আলো দেখা যাচ্ছে। রুমের পাশে গিয়ে জানালা দিয়ে প্রিয়াকে বাইরে আসার জন্য ইশারা দিলাম।

সে প্রথমে খুব ইতস্তত করে পরে ভয়ে ভয়ে বাইরে এলো।

অনেক দিন পর দেখা হওয়াতে দুজন দুজনাকে জড়িয়ে ধরে হ্যাপি ভ্যালেনটাইস ডে-র শুভেচ্ছা জানালাম।

কিছুক্ষণ পর প্রিয়া জিজ্ঞাসা করলো, ভাবীকে দেয়া ওয়াদা ভঙ্গ করাটা কি ঠিক হলো?

বললাম, কি করবো বলো? তোমার বিরহে আমি যে পাগল প্রায়!

প্রিয়া বললো, এতো ভালোবাসো আমাকে?

বললাম, কেন সন্দেহ হয়?

প্রিয়া হেসে উঠে গালে ছোট একটি আদর দিয়ে বললো, আজকের প্রোগ্রামটা হিমেলভাইয়া নষ্ট করে দিলেন।

বললাম, তুমি আমাকে একটি শাদা কাপড়ের ব্যবস্থা করে দিতে পারবে? তাহলে হিমেলভাইয়াকে আমাদের প্রোগ্রাম নষ্ট কার শাস্তি হিসেবে আজ মজা দেখাবো।

প্রিয়া জানতে চাইলো, কিভাবে?

কিছুক্ষণ আগে হিমেলভাইয়া আর ভাবী পাওয়ার হাউসের কাছে গিয়েছেন। তুমি আমাকে একটি শাদা কাপড় ব্যবস্থা করে দাও।

বাড়ির সামনে কবরস্থানের বড় আম গাছটায় উঠে আজকে তাদেরকে ভয় খাওয়াবো।

এ রকম মজা করাটা প্রিয়া সমর্থন করলো না। সে বার বার আমাকে বারণ করার পরও আমার আনাড়ি আবদারের কারণে ঘর থেকে তার নানির নামাজের শাদা কাপড়টা এনে দিতে বাধ্য হলো।

চুপি চুপি বড় আম গাছের ডালে উঠে বসলাম।

ভাইয়া আর ভাবী কি একটা কথা নিয়ে খুব হাসাহাসি করতে করতে আসছেন।

তারা কবরস্থানের আম গাছটার নিচে আসা মাত্রই ভয়ংকর এক শব্দ করে লেজের মতো শাদা কাপড়টা নিচের দিকে ছেড়ে দিলাম।

ভাবী এ দৃশ্য দেখে জোরে চিৎকার দিলেন।

সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞান হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন।

তাকে ধরাধরি করে বাড়িতে নেয়া হলো। রাতে ভাবীর ভীষণ জ্বর এলো।

কতো ডাক্তার কবিরাজ আনা হলো, কিছুতেই ভাবীকে আর সুস্থ করা গেল না।

পাচ দিনের মাথায় ভাবী আমাদের সবাইকে ছেড়ে চিরদিনের জন্য দুনিয়া থেকে চলে গেলেন।

হেমাভাবীর মৃত্যুর কিছুদিন পর হিমেলভাইয়া মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেললেন।

তারও কিছুদিন পর প্রিয়া তার বাপ মায়ের কাছে চলে গেল।

যাওয়ার সময় ভাবীর কবরের পাশে আমার সঙ্গে চোখাচোখি হলো।

প্রিয়া কঠিন চোখে আমার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে তার দুই চোখ বেয়ে কয়েক ফোটা জল গড়িয়ে পড়লো।

নীরব-নিথর হয়ে প্রিয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। কোনো কথাই বলতে পারলাম না।

আরো কিছুদিন পর জানতে পারলাম প্রিয়ার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে।

প্রিয়ার মুখোমুখি দাড়ানোর কোনো পথই আমার আর খোলা রইলো না। নিঃসঙ্গ হয়ে গেলাম।

আজ দশ বছর পরে এ ঘটনা কাগজে লিপিবদ্ধ করতে গিয়ে নিজের দুই চোখ ঝাপসা হয়ে আসছে।

সউদি আরব থেকে

একটি কালো মেয়ের প্রেম

– আশরাফুর রহমান লাল

তারাশংকর-এর মতো করেই বলি, *মেয়েটি কষ্টি পাথরের মতো কালো, শ্যাওলার মতো নরম*।

তার নাম স্বপ্না।

ডিনা, শাকিলা, মিতালী নামের সুন্দরী মেয়েদের পেছনে ঘুরলাম অনেক। কিন্তু মন্দ কপাল আমার, কেউ পাত্তা দিল না।

চেহারাটা আমার আহামরি সুন্দর না হলেও খারাপ নয়। এসএসসি-তে ভালো রেজাল্ট করে কলেজে ভর্তি হয়েছি। কলেজের দুই তিনজন ভালো ছাত্রের মধ্যে একজন। তবু ভাগ্যে জুটলো না শ্বেতকপোতীর মতো সুন্দরীদের প্রেমে।

মনটা যখন নীড়হারা পাখির মতো তখন স্বপ্না ধরা দিল আমার কাছে। হোক সে যতোই কালো। ভালো লেগেছিল তার কালো হরিণ চোখ, ধারালো নাক, সুন্দর চিবুক। শুধু গায়ের রঙটাই কালো।

কখনো কলেজের সিড়িতে, কখনো বুলবুল সরণির নারকেল গাছের নিচে, কখনো আলাউদ্দিনের চায়ের দোকানের পেছনে কথা হতো। সবাই তাকাতো আড়চোখে। ডিনা, মিতালীর মতো সুন্দরীরা দেখে ঠোট বাকাতো।

একদিন সিড়িতে দাড়িয়ে কথা বলছি।

সালাম নামের এক বন্ধু নামছিল দোতলা থেকে। মুখের ওপরই বলে ফেললো, কি দোস্ত, শেষ পর্যন্ত মিস আলকাতরার প্রেমে পড়লি! শালা চান্দু।

মুহূর্তের মধ্যে স্বপ্নার কালো মুখটা আরো কালো হয়ে গেল।

আমিও খুব কষ্ট পেলাম।

কলেজে কথা বলা প্রায় বন্ধ হলো। নিত্য আসা-যাওয়া হতে লাগলো তাদের বাড়িতে।

রহনপুর পোস্ট অফিসের কাছে আকবর চৌধুরীর বিশাল বাড়ির পাশেই তাদের বাসা। স্বপ্নার বাবা চৌধুরী বাড়ির দফাদার। বাবার চেহারাটাও কালো নিগ্রোর মতো এবং খর্বাকায়। স্বপ্নার মায়ের গায়ের রঙ বেশ ফর্শা ও সুঠাম দেহের অধিকারী। মেয়েটা যদি মায়ের মতো রঙ পেতো তাহলে অদ্ভুত সুন্দরী হতো নিঃসন্দেহে। স্বপ্নার ছোট বোন কল্পনা মায়ের মতো ফর্শা। তখন পড়ে ক্লাস সিক্সে।

রোজ বিকেলে স্বপ্না দাড়িয়ে থাকতো দরজার কাছে। অপেক্ষা করতো আমার জন্য। আমাকে দেখেই এক ঝলক হাসি ফুটে উঠতো তার মুখে।

স্বপ্নাদের বাড়ির পাশেই এক বন্ধুর বাড়ি। নাম বাচ্চু। বাচ্চু আমাকে মাঝে মধ্যে ওদের বাড়িতে যেতে দেখতো।

একদিন বাচ্চু বলেই ফেললো, স্বপ্নার মতো একটা কালো পেতনির প্রেমে পড়বি ভাবতেই পারছি না। তুই শালা একটা আস্ত গাধা। ওর বাবা চৌধুরী বাড়িতে দফাদারী করে। আর ওর মা তো আকবর চৌধুরীর রক্ষিতা। স্বপ্নার লেখাপড়ার খরচসহ সব কিছুই করে চৌধুরী সাহেব।

বাচ্চুর কথা শুনে মনটা আমার চুপসে গিয়েছিল।

এইচএসসি পাসের পর ভর্তি হলাম রাজশাহী ইউনিভার্সিটিতে। এপলাইড ফিজিক্স অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্সে। পাবনার মেয়ে শাহীনের সঙ্গে পরিচয় হলো। শাহীন পড়ে কেমিস্ট্রিতে। শাহীনের সঙ্গে আস্তে আস্তে ভাব জমতে লাগলো। শাহীন যতোই আমার কাছে আসতে লাগলো, স্বপ্না নামের কালো মেয়েটি ততোই দূরে সরে যেতে লাগলো আমার মন থেকে।

আমার হস্টেলের ঠিকানায় চিঠি লিখতো স্বপ্না। পাচটা চিঠি পেলে একটা দায়সারা গোছের উত্তর দিতাম। এক সময় সেটাও বন্ধ করে দিলাম। স্বপ্নাকে ভুলে গেলাম। হৃদয়ের মণিকোঠায় একটি নাম শাহীন যার গায়ের রঙ ধবধবে শাদা।

সামার ভ্যাকেশনে শাহীন গিয়েছিল বাড়িতে। হঠাৎ করে ওর বিয়ে হয়ে গেল এক প্রকৌশলীর সঙ্গে। ভালো পাত্র পেয়ে ওর বাবা হাতছাড়া করেননি। একটা খবর পর্যন্ত দিল না শাহীন।

কয়েকদিন ঘুমের বড়ি খেয়ে উপশম করলাম মনের যন্ত্রণা। আর্থিক অসুবিধার কারণে পড়াশোনা ছেড়ে ঢুকতে হলো ব্যাংকের চাকরিতে কেরানি পদে। এর মধ্যে প্রাইভেটে বিএ পরীক্ষায় পাস করে ফেললাম। বিসিএস পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিতে লাগলাম যদি জীবনের ক্ষতিটা পুষিয়ে নেয়া যায়। কিন্তু বিফলে গেল সব কিছু। শেষ পর্যন্ত কিছুই হলো না।

ইতিমধ্যে স্বপ্নার বিয়ে হয়ে গেছে বরেন্দ্র অঞ্চলের এক গণ্ডগ্রামে। বিয়ের আগে ও খবর দিয়েছিল। চিঠিতে বার বার লিখেছিল আমি যেন তার সঙ্গে একটিবার দেখা করি।

লিখেছিল, আমি কালো বলে কি আমার ভালোবাসা কি একেবারেই মূল্যহীন? তুমি যদি আমাকে আশ্বাস দাও তাহলে এ বিয়ে ঠেকিয়ে দেবো। তোমাকে যে কিছুতেই ভুলতে পারছি না।

না। আমি তার কাছে যাইনি কিংবা কোনো উত্তরও দিইনি।

কয়েক বছর পেরিয়ে গেছে। আমি তখন সংসার পেতেছি। শাদা ধবধবে চেহারার একটি স্ত্রী পেয়েছি।

সাদেক নামের এক বন্ধু স্বপ্নার শ্বশুরবাড়ির এলাকাতে বিয়ে করেছে। সাদেকের সঙ্গে দেখা হলেই স্বপ্না জানতে চাইতো আমি কেমন আছি, আমার স্ত্রী দেখতে সুন্দর কি না ইত্যাদি।

সাদেক একদিন জানালো, স্বপ্না ভালো নেই দাম্পত্য জীবনে। স্বামী একজন মাতাল, জুয়াড়ি। প্রায়ই শারীরিক অত্যাচার করে স্বপ্নাকে।

তারপর একদিন শুনলাম স্বামীর অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে সে আত্মহত্যা করেছে গলায় দড়ি দিয়ে।

স্বপ্নার অকাল মৃত্যুর খবর শুনে মনটা যেন কেমন হয়ে উঠলো আমার। নিজেকে ভীষণ অপরাধী ও স্বার্থপর মনে হলো। আমি তার ভালোবাসার মূল্য দিইনি।

হঠাৎ করে তার চেহারাটা ভেসে উঠলো আমার চোখের সামনে। স্বপ্না দাড়িয়ে আছে তার বাড়ির দরজার সামনে। আমাকে দেখেই তার মুখে সুন্দর হাসির ঝিলিক ফুটে উঠলো। আর কোনোদিন সে আমার জন্য এমন করে অপেক্ষা করবে না। আমাকে দেখে তার মুখে ফুটে উঠবে না সেই মোহনীয় হাসি।

ভোলাহাট, চাপাইনবাবগঞ্জ থেকে

সহযাত্রী

– খায়রুল আক্তার

যাচ্ছি লন্ডনে। এয়ারপোর্টে আমার কান্নার ধরনে মানুষ হয়তো ভেবেছে আমাকে নির্বাসন দেয়া হচ্ছে।

কান্নার মধ্য দিয়েই এক সময় বৃটিশ এয়ারওয়েজে উঠে বসলাম। পাশের সিটে বসা যুবকটিকে দেখে চমকে উঠলাম। মনে হলো কতো যুগ ধরে তাকে চিনি। আমার কেন এমন মনে হলো জানি না। মনে হচ্ছিল এ লোকটির জন্যই যেন আমার ছাব্বিশটি বছর গুণে গুণে পার করেছি। এ যেন আমার আকাঙ্ক্ষার পুরুষ।

প্রথম থেকেই সে আমার সঙ্গে অত্যন্ত আন্তরিক ব্যবহার করছিল। এয়ারহস্টেস খাবার নিয়ে এলে সেই আমাকে এগিয়ে দিল।

খাওয়ার পর কেমন যেন হাই উঠছিল। অনবরত কান্নার ফলে শরীরও অবসন্ন লাগছিল।

এমন সময় দেখি হঠাৎ একজন লোক হাসি মুখে আমাকে ডাকছে।

বোকার মতো তার দিকে তাকিয়ে রইলাম।

বললো, চিনতে পারছো না? তোমার ব্যাগ থেকে আমার ছবিটি বের করো, তাহলেই ঠিকই চিনবে।

ছবি বের করলাম, তাকে চিনলাম এবং তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনার সঙ্গে আমার মামা আসার কথা ছিল, তিনি কোথায়?

উত্তর দিল, ইচ্ছে করেই আনিনি তোমাকে সারপ্রাইজ দেবো বলে।

তারপর আর বলার কিছু থাকে না। উঠে তার সঙ্গ নিলাম।

একটা বাগানের ভেতর দিয়ে হাটছি।

তিনি বলছেন, এটা হচ্ছে স্বর্গীয় উদ্যান। আর ওই গাড়িগুলো দেখছো, ওগুলো হচ্ছে *ক্যারাভ্যান।* চলো আজ আমরা ক্যারাভ্যান–এ করে বেড়াবো।

বললাম, না আপনার বোধহয় মনে নেই হযরত আদম (আ.)–এর নিষিদ্ধকালের গল্প। আমি ক্যারাভ্যানে সংসার পাতার পক্ষে নেই। পরে সব দোষ নারীদের হয়।

যার সঙ্গে হাটছি তিনি হচ্ছেন আমার স্বামী। কিছুদিন হয় তার সঙ্গে টেলিফোনে আমার বিয়ে হয়েছে। কিন্তু তাকে কখনো দেখিনি। উর্ধ মুখ তুলে তাকালাম এবং অবাক হলাম। এতো আমার পাশের সহযাত্রী শওকত। বললাম, লোকে মন্দ বলবে, চলুন বাসায় যাই।

এমন সময় অনুভব করলাম আমার কাধে হাত দিয়ে নাড়া দিচ্ছেন তার দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য। তাকালাম আমার পাশের যাত্রীটি মিটি মিটি হাসছে। বলছে, যাহোক, খুব ঘুমালেন, তার মধ্যে বিড় বিড় করে কি যেন বলছিলেনও।

আমার ঘুমের ঘোর তখনো কাটেনি। আমার মাথা তখনো তার কাধের ওপর, আমার হুশ হলো। চেয়ে দেখি আমার গায়ে একটি সুন্দর কম্বল জড়ানো।

আপনি তো নিজের কম্বলের ওপর বসেছিলেন। শীতে কাপছিলেন। তাই আমারটাই দিলাম।

সোজা হয়ে বসলাম। তার কম্বল ফিরিয়ে দিলাম। তার দিক থেকে মুখও ফিরিয়ে নিলাম।

প্লেন হিথরো এয়ারপোর্টে ল্যান্ড করার পর উঠে দাড়ালাম, সঙ্গে তিনিও দাড়ালেন।

বললেন, চলুন এগিয়ে দিই। আমার ফ্লাইটের একটু দেরি আছে।

কিছুটা পথ যাওয়ার পর তিনি বললেন, এতোটা পথ একসঙ্গে এলাম, আপনার নাম বা ঠিকানা কিছুই জানি না। কিন্তু আপনাকে ভালোবেসে ফেলেছি।

বোবা দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইলাম। মনে হলো, একটা কষ্ট দলা পাকিয়ে গলায় ওঠে এসেছে। ঠোট দুটো অবাধ্যের মতো কাপছে। ইচ্ছে হচ্ছে বলি শওকত, তোমার বলিষ্ঠ হাত দিয়ে আমার ঠোটের কম্পনটুকু

থামিয়ে দাও। তুমি বড্ড দেরি করে এলে। সময় বয়ে গেল অপলক। রয়ে গেল কয়েকটি মুহূর্ত অবিস্মরণী হয়ে থাকবে বলে, স্মৃতির কৌটায় সংরক্ষিত থাকবে বলে।

বললাম, ভুল করেছেন, আমি বিবাহিতা, টেলিফোনে আমাদের বিয়ে হয়েছে, যাই।

মনে মনে বললাম, আমিও তো তোমাকে ভালোবেসে ফেলেছি!

ইংল্যান্ড থেকে

শেষ মুহূর্তে

– আল ফাত্তাহ বিন মমতাজ দিতু

২০০৩ সালের ঘটনা। সবে কলেজে উঠেছি। বড়দের মুখে শুনেছি ফার্স্ট ইয়ার ড্যাম কেয়ার। আমাদের মধ্যেও তাই। এরই মধ্যে এসে গেল ১৪ ফেব্রুয়ারি সেন্ট ভ্যালেনটাইনস ডে অর্থাৎ ভালোবাসা দিবস।

আমাদের বন্ধুদের গ্রুপটি আবার দশ সদস্যের। এর মধ্যে আবার পাচজন প্রেম করে। তাই ভালোবাসা দিবসে আমরা কি করবো তার চিন্তা ভাবনার মধ্যে এরা বাদ গেল। আমরা ঠিক করলাম এই দিনে আমরা আমাদের কলেজেরই পাচজন পরিচিত মেয়েকে অফার দেবো। কে কাকে অফার দেবে এটা ঠিক হলো ১৩ ফেব্রুয়ারি।

আমার ভাগ্যে যে মেয়েটির নাম এলো তার নাম নিপা। তার বাসা আমার বাসার ঠিক পেছনে। একটি জাম গাছ আমাদের দুই বাড়িকে পৃথক করেছে। নিপা যথেষ্ট অহংকারী বলে বন্ধু মহলে পরিচিত। ফলে আমার মাথায় হাত। বন্ধুদের বার বার বোঝালাম, অন্য একজনকে দে আমাকে।

ওরা কিছুতেই রাজি হলো না।

অগত্যা ১৪ ফেব্রুয়ারি সকাল দশটায় কলেজের সামনে ওকে একটি গোলাপ কলি দিয়ে ভালোবাসা জানালাম।

ও আমার ফুলটি নিল, কিন্তু এমন দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালো যেন এ মুহূর্তেই আমাকে কাচা খেয়ে ফেলবে।

তারপর ওকে বললাম, যদি ভালোবাসো ঠিক পাচটায় বোটানিকাল গার্ডেন–এ যেও।

ও কিছু না বলে চলে গেল।

বুঝলাম আসবে না। এদিকে কলেজের ভেতর এসে শুনি বাকি চারজনই সফল হয়েছে।

আমার কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে ওরা আমাকে সান্ত্বনা দিল। বললো, দেখবি ঠিকই আসবে।

বোটানিকাল গার্ডেনে ঠিক পাচটায় পৌছে ওর জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। কিন্তু হায়! দুই ঘণ্টা অপেক্ষা করার পরও নিপা এলো না। বাসায় আসার পর বন্ধুরা ফোন বাজলো। করে সান্ত্বনা দিতে লাগলো।

রাত এগারোটায় আমার ডায়রিতে লিখলাম ১৪ ফেব্রুয়ারি আমার প্রথম ছ্যাকা দিবস। এরপর বুক ফেটে এলো জল। জলটা এলো লজ্জা আর অপমানে। ঠিক এমন সময় ফোন রিসিভার ওঠালাম।

একটা মেয়েটি কণ্ঠস্বর বললো, জামতলায় এসো।

কে বললো, তার নামও জিজ্ঞাসা করলাম না। সরাসরি জামতলায় এসে দেখলাম নিপা দাড়িয়ে আছে। নিপাকে দেখে বললাম, যা করার তা তো করেছোই। আবার ডাকলে কেন?

নিপা বললো, আমার ছোট ভাইটি আজ মাথা ফাটিয়েছে। তাই আসতে পারিনি। বাসায় আম্মা না থাকায় আমাকেই সব সামলাতে হয়েছে।

বললাম, একবার ফোন করে জানাতে।

ও বললো, তোমার ফোন নাম্বার মাত্র পেলাম। সরি। মাফ করে দাও।

ঘড়িতে তাকালাম, ঠিক বারোটা বাজে। ওকে বললাম, খোদা রক্ষা করলো। না হলে আজ ছ্যাকা দিবসই হয়ে যেতো।

নিপা আমার হাত ধরলো। অশ্রুসজল চোখে আমাকে বললো, ভালোবাসি।

আমিও বললাম, ভালোবাসি।

এরপর নিপা ও আমার সম্পর্ক এখনো টিকে আছে। অথচ ওই বন্ধুদের সম্পর্ক আর টিকে নেই যারা আমাকে নিয়ে টিটকারি করতো।

ময়মনসিংহ থেকে

সাইকেলে

– দেলোয়ার হোসেন

সেই ১৯৯৪ সালের মাঝামাঝি সময়ে আমাদের ভালোবাসার শুরু। আজ ২০০৪ সাল। ইতিমধ্যে দশটি বছর পার করেছি আমরা। হাসি–আনন্দ, দুঃখ–বেদনায় একাকার হয়ে আছে আমাদের দশ বছর।

একই স্কুলে পড়তাম আমরা। আফরোজা ক্লাস সেভেনে আর আমি ক্লাস নাইনে। অনেক কষ্ট করে ওর মন পেতে হয়েছিল আমাকে। অনেক সাধনার পর তার মনের রাজ্যের দখল পেয়েছি। ওকে পাবার জন্য কতো রকমের পাগলামো যে করেছি তার ইয়ত্তা নেই। সেগুলো বোকা বোকা প্রেমের কথা, না–ই–বা লিখলাম।

সে বছর শবে কদরের রাতে আল্লাহর কাছে দুই হাত তুলে মোনাজাত করলাম, হে আল্লাহ, তোমার কাছে আমি আর কিছুই চাই না, শুধু আফরোজাকে আমার করে দাও। সবাই যখন পাপ মোচনের জন্য দোয়া করছে, আমি তখন ওর ভালোবাসা পাবার নেশায় বিভোর।

আল্লাহর কাছে খাস নিয়তে কিছু চাইলে অবশ্যই পাওয়া যায়। তাছাড়া আমার পাওয়ার মাঝে কোনো পাপ ছিল না।

অবশেষে আফরোজার ভালোবাসা পেলাম। ঠিক যেন আকাশের চাদটা হাতে পেয়ে গেলাম।

আমার এলোমেলো জীবনের রুটিন ঠিক করে দিল সে। প্রতি সপ্তাহে একটি করে চিঠি লিখতো আমাকে। সেখানে ভালোবাসার কথার চেয়ে এক রাশ উপদেশে ভরপুর থাকতো। যেমন তোমাকে মানুষের মতো মানুষ হতে হবে। আমাকে যেমন ভালোবাসে তারচেয়ে ঢের বেশি পাঠ্য বইকে ভালোবাসতে হবে। মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করবে। আর কখনো বাশি বাজাতে পারবে না। মাথার চুল খুব বড় করা যাবে না। আবার ন্যাড়াও হতে পারবে না।

ওর কথার বিন্দুমাত্র অবাধ্য হতাম না। প্রেমে পড়লে মানুষ বুঝি এ রকমই হয়! ওর আদর শাসনে স্কুলের সেরা ছাত্র হয়ে উঠলাম।

অতি গোপনে আমাদের প্রেম চলতে লাগলো। আগে পিছে প্রায় ডজন খানেক পিয়ন। ধরা পরার কোনো সম্ভাবনা নেই।

ক্লাস নাইন থেকে অনেক বেশি নাম্বার নিয়ে ক্লাস টেনে উত্তীর্ণ হলাম বিধায় সেরা ছাত্রের পুরস্কারও আমার ভাগ্যে জুটলো।

সব কিছু আমার দিল আফরোজার অবদানে।

দশ বছরে আমরা অনেকগুলো ভালোবাসা দিবস পার করেছি। কিন্তু ভালোবাসা দিবসের কোনো স্মৃতি নেই আমাদের। অর্থাৎ এতোটা বুঝতাম না আর কি! বুঝেছি অবশ্য যাযাদির ভালোবাসা সংখ্যা থেকেই। এই জন্য যাযাদির কাছে চিরকৃতজ্ঞ।

২০০৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে রাজশাহীতে একটা প্রোগ্রামের জন্য গিয়েছিলাম। সেখান থেকে ফেরার পথে বাসস্ট্যান্ডের এক পত্রিকা স্টল থেকে কিনেছিলাম সে বছরের ভালোবাসা সংখ্যা।

মেইল বাস মিস করেছিলাম। লোকাল বাসে নওগা পৌছাতে প্রায় আড়াই ঘন্টা লেগে যাবে। এই দীর্ঘ সময় বসে থাকা খুবই বিরক্তিকর। সঙ্গী হিসেবে বেছে নিলাম যাযাদির ভালোবাসা সংখ্যা। পত্রিকাটা আমাকে

এমনভাবে সঙ্গ দিল, কখন যে নওগা এসে পৌছেছি, খেয়াল করিনি। এর মধ্যে প্রায় অর্ধেক পড়া শেষ। যতোই পড়ছি ততোই মুগ্ধ হচ্ছি। নিয়ত করেছি প্রতি বছরের ভালোবাসা সংখ্যা আমাদের সংগ্রহে রাখবো। পড়া শেষ করে আফরোজাকে পড়তে দিয়েছিলাম।

ও বলেছিল, এমন একটা পত্রিকার সঙ্গে তোমার পরিচয় হওয়া উচিত ছিল অনেক আগে।

আশা করেছিলাম, আফরোজা যেন আমাকে সামনে ভালোবাসা দিবস পালনের জন্য বলে।

ও খবর পাঠালো, ওই দিন যেন তৈরি থাকি।

কিন্তু বাদ সাধলো হরতাল। ওই দিন আওয়ামী লীগের ডাকে সারা দেশব্যাপী হরতাল চলছিল। তাই সাইকেল নিয়েই আমরা বের হয়েছিলাম। ভেবেছিলাম এই প্রথম যখন ভালোবাসা দিবস পালন করছি তখন একটু জাকজমকভাবে পালন করবো। বেরসিক হরতাল সেটা হতে দিল না। হরতাল না হলে ওকে নিয়ে দূরে কোথাও যেতাম। সিনেমা দেখতাম, ছবি তুলতাম। সব ভাবনায় ছেদ ফেলে দিল হরতাল।

কি আর করা! অবশেষে সাইকেলের ক্যারিয়ারে ওকে চড়িয়ে রওনা হলাম হাইওয়ের পথ ধরে। আফরোজা এর আগে সাইকেলে চড়েনি। তাই ভয় করছে।

অভয় দিলাম, আমি আছি, ভয় নেই।

ওর কোমল হাত আমার কোমর জড়িয়ে ধরলো সাপের মতো।

বুঝতে পারছি ও কাপছে।

এক সময় সাইকেল থেকে নামালাম আমরা।

ও ব্যাগ থেকে একটা লাল গোলাপ আমার হাতে দিয়ে বললো, I love you।

ওর দিকে তাকালাম। অসম্ভব সুন্দর লাগছিল আজকে ওকে। আমিও বললাম, I love you too।

সান্তাহার পোতা রেলগেট থেকে আমরা বালুডাঙ্গা বাসস্ট্যান্ড এসে থামলাম। তখন দুপুর। ক্ষিধে পেয়েছে, খাওয়া প্রয়োজন। হরতালের কারণে এখানে ভালো হোটেলগুলো বন্ধ।

ওকে নিয়ে এক হোটেলে দুপুরের খাবার সাঙ্গ করলাম।

সেই গুচি মাছের ভুনার স্বাদ আজও জিভে লেগে আছে।

আবার ওকে নিয়ে রওনা দিলাম। এবার বাড়ির দিকে। নদীর ঘাটে এসে আমরা আলাদা হয়ে গেলাম। কেউ দেখে ফেললে সর্বনাশ হয়ে যাবে। চলে গেল আফরোজা শেষবারের মতো দৃষ্টি বিনিময় করে।

যাবার পর খেয়াল হলো ভালোবাসা দিবসে একটা চুমু পর্যন্ত দেয়া হলো না। আফসোস করে আর কি হবে! সব কিছু ঠিক থাকলে আগামীতে...।

ঠিকানা বিহীন

সর্বজনীন

– মাহমুদুল ইসলাম

ভোরে সূর্য উঠলে রাতের আধার কেটে যায়, চারদিক পরিষ্কার হয়ে আসে, শুরু হয় একটি দিনের। আজ পহেলা শ্রাবণ। ক্যালেন্ডারের দিকে চোখ পড়তেই আমার মনে পড়ে গেল ঠিক পনেরো বছর আগের কথা। সেদিনটি আমার জন্য আনন্দের ছিল।

সেদিন তাকে প্রথম দেখেছিলাম। ইউনিভার্সিটির সামনে আমার এক বান্ধবীর সঙ্গে দাড়িয়ে কথা বলছে।

প্রথম দেখাতেই তাকে ভালোবেসে ফেলি। সেদিনই বিকেলে বান্ধবীর বাড়ি গিয়ে ভালোবাসার কথাটা জানাই। রাতে বান্ধবী ফোন করে বলে, তোমার ভালোবাসার কথা বলে দিয়েছি। আগামীকাল সকাল দশটায় তোমাকে রমনায় যেতে বলেছে।

চাপা উত্তেজনা বোধ করি।

পরদিন যথাস্থানে গিয়ে দেখি, সে একটা বেঞ্চিতে বসে আছে।

তার পাশে গিয়ে বসে কুশল বিনিময়ের পর সরাসরি বলি, বুঝতেই পারছেন কি বলতে চাই।

সে বলে, আমাকে ভালোবাসা হয়?

সম্মতিসূচক মাথা নাড়ি।

এই ভালোবাসি শব্দটা শুনতে শুনতে কান পচে গেছে।

এর আগেও শুনেছেন বুঝি?

আমার চেহারা অতোটা খারাপ নয়। তা আমাকে যে ভালোবাসা হয় তার প্রমাণ কি?

হা করে তার দিকে চেয়ে থাকি। তার প্রশ্নের উত্তর খুজে পাই না।

সে বলে, প্রেম ও ভালোবাসা একই জিনিস বলে মনে হয়?

ভালোবাসার মধ্যে কিছু নোংরামি আছে। সেগুলো হলো প্রেম। আর দেহহীন প্রেম হলো ভালোবাসা।

বাহ! কথা তো ভালোই জানা আছে দেখছি। মেয়ে মানুষ পটাতে সুবিধা হবে।

আমি কি অন্যায় বা খারাপ কিছু বলেছি?

আমি অবুঝ নই।

কারো সঙ্গে সম্পর্ক আছে?

প্রেম–ভালোবাসার মতো সম্পর্কে এখনো জড়াইনি।

জড়ানোর ইচ্ছে আছে?

নিশ্চয়। তবে প্রেম করার ইচ্ছে নেই, ভালোবাসার ইচ্ছে আছে। কিন্তু বর্তমান সময়ের ভালোবাসা? পুরুষ এখন নারীকে ভালোবাসে তার রূপ ও দেহ দেখে আর পুরুষকে নারী ভালোবাসে তার মানিব্যাগ কতোটুকু ফোলা সেটা দেখে। আচ্ছা, নারীর ওই এক রূপ এবং দেহতেই কি পুরুষের সব ভালোবাসা সীমাবদ্ধ?

এটা বিতর্কিত বিষয়। শুধু একটা কথা বলি, একজন নারী কি পরিমাণে রূপসী এবং পুরুষের লালসা ও প্রবৃত্তিকে সে কি পরিমাণে নিবদ্ধ এবং তৃপ্ত রাখতে পারবে তা দিয়েই নারীত্বের মূল্য বিচার করা হয়। এ কথাটা আমার নয়, শরৎচন্দ্রের। আর আপনি যে ভালোবাসার কথা বললেন, তা একেবারে ভুল নয়।

আমার পাশে বসে থাকা পুরুষটিও কি আমাকে সে রকমভাবে ভালোবাসে?

আমি স্তম্ভিত। এ কথার কি উত্তর দেবো? প্রসঙ্গ বদলাই। কারো সঙ্গে তাহলে সম্পর্ক নেই?

কিছু ছেলে বন্ধু আছে। শুধু বন্ধু নয়, খুব ভালো বন্ধু। মজার ব্যাপার হলো, তারা সবাই আমাকে ভালোবেসে পেতে চায় একান্তভাবে।

আপনি একজন মেয়ে। আর আপনাকে ভালোবাসে একাধিক পুরুষ?

প্রশ্নটা আমিই করতাম। আজ নতুন একজন পুরুষ যোগ হলো। আমি এখন কি করবো? আমার তো একটি মাত্র শরীর, একটি মাত্র মন। কতোজনকে দেবো?

চিন্তিত হলাম। এ মেয়েটা সাধারণ মেয়ে নয়।

সে বলে, এর আগে কয়টা মেয়েকে ভালোবাসি বলা হয়েছে?

একজনকেও নয়, ভবিষ্যতেও কাউকে বলবো না।

এ কথাটা আমার হাত ছুয়ে বলা যাবে?

হাত ছোবো? ঢোক গিলে বললাম।

মনে অপরাধ বোধ কাজ না করলে হাত স্পর্শ করতে কোনো সমস্যা দেখি না।

তার হাতে হাত রেখে বলি, ভবিষ্যতে কোনো নারীকে ভালোবাসবো না। বলে হাত সরিয়ে নিই।

সে বলে, কথাটা যেন মনে থাকে। ভালোবাসা শুধু অর্জন নয়, ত্যাগও করতে শেখায়। বিশ্বাস হয়?

আলবত।

তাহলে বলি, আগামী মাসে আমার বিয়ে।

কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থাকি। কিন্তু বুঝে ওঠার আগেই সে বলে, একটু আগেই ত্যাগের কথাটা নিজ মুখে স্বীকার করা হয়েছে। আমাকে প্রকৃতভাবে ভালোবাসলে ত্যাগ করতে কোনো কষ্ট হবার কথা নয়। ভালোবাসার স্বাদ উপভোগ না করে তাকে বুকে আগলে ধরে রাখাটাই বড় ব্যাপার। সবাই ওটা পারে না। আমার বিয়ে যদি নাও ঠিক হতো, তাহলেও আমার পাশে বসে থাকা মানুষটির সঙ্গে আজ আমার যে সম্পর্ক গড়ে উঠলো তা ভালোবাসার চেয়ে কম কিসে?

ক্লান্ত স্বরে বলি, বন্ধুত্ব।

সে হেসে বলে, আমরা আজ থেকে খুব ভালো বন্ধু। হয়তো সেই বন্ধুত্বের মধ্যেই আমরা ভালোবাসা খুজে পাবো। ভালোবাসার প্রধান শর্ত হলো বন্ধুত্ব। বন্ধুত্বে কখনো চিড় ধরে না যদি সেটা বন্ধুত্বের মতো বন্ধুত্ব হয়। এবং সেই রকম বন্ধুত্বই হলো প্রকৃত ভালোবাসা। আর এখন থেকে আমাকে আপনি নয়, তুমি।

আমার ভেতরটা কেমন যেন করে ওঠে। একেই কি ভালোবাসা বলে?

সে বলে, আমি বিশ্বাস করি, একটি ভালো মানুষের সঙ্গে আজ আমার বন্ধুত্ব হলো। জীবনে সুন্দর চেহারার মানুষের চেয়ে সুন্দর মনের মানুষ হওয়া জরুরি। সত্যি বলতে, আমিও সুন্দর মনের মানুষ হয়ে উঠতে পারিনি। তার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। এবং সুন্দর মনের মানুষকে ভালোবাসি। কারণ তারাই ভালোবাসতে জানে।

তার হাতের ওপর হাত রেখে বলি, অরুণা, তোমাকে ভালোবাসি।

সে নিচু স্বরে বলে, আমিও।

হাতটা সরিয়ে নিই।

সে বলে, চলে যাচ্ছি। যদি কোনো ভুল করে থাকি তবে ক্ষমাপ্রার্থী। একটা কথা বলি, ভালোবাসাটা ব্যক্তি মনের অভ্যন্তরীণ বিষয়। কাউকে ভালোবাসলে বলার প্রয়োজন হয় না যে, আমি তোমাকে ভালোবাসি।

সে একটা রিকশা ডেকে তাতে উঠে বসে। হুড তুলে দেয়ার আগে আমার দিকে চেয়ে মিষ্টি করে হাসে।

এখন সকাল দশটা। ক্যালেন্ডারের দিকে তাকানোয় কতো কিছু মনে পড়ে গেল। কাধে হাতের স্পর্শে পেছন ফিরলাম। সূচনা আমার হাতে রজনীগন্ধার তোড়া তুলে দিয়ে বললো, শুভ বিয়েবার্ষিকী।

ফুলগুলো হাতে নিয়ে বললাম, সূচনা, তোমাকে ভালোবাসি।

সূচনা বললো, বারো বছর আগে যেদিন তোমাকে পেলাম সেদিন থেকে তো তোমার ভালোবাসাতেই বেচে আছি। বাকিটা জীবনও সেভাবে বাচতে চাই। এ কথা বলে সূচনা আমাকে জড়িয়ে ধরলো।

রাত দশটায় অরুণা আমাকে ফোন করলো, রুদ্র, আমি অরুণা। ভালো আছো?

ভালো। তুমি?

কেটে যাচ্ছে। আসলে রাহাত দেশের বাইরে আছে তো। প্রতি বছর তো ওকে নিয়েই তোমাদের বিয়েবার্ষিকীতে আসি। আজ আর একা আসতে ইচ্ছে হলো না। রাহাত ওর অনুপস্থিতির জন্য তোমার কাছে আন্তরিকভাবে ক্ষমা চেয়ে নিতে বলেছে। তোমাকে তো শুভেচ্ছাই জানানো হলো না। শুভ বিয়েবার্ষিকী তোমাকে এবং অবশ্যই সূচনাকে।

ধন্যবাদ। আজ আমাদের বন্ধুত্বের বারো বছর পূর্ণ হলো, তাই না?

শুধু বন্ধুত্ব নয়। বন্ধুত্ব এবং ভালোবাসা।

তোমাকে ভালোবাসি অরুণা।

আমিও।

অরুণা ফোন রেখে দিল।

মনে মনে বললাম, কে যে কাকে ভালোবাসে তা সৃষ্টিকর্তাই জানে।

এখন শেষ রাত। কিছুক্ষণ পরই সূর্য উঠবে। ভোর হবে। রাতের আধার কেটে যাবে। চারদিক পরিষ্কার হয়ে আসবে। শুরু হবে একটি নতুন দিন।

সূচনা আমার পাশে শুয়ে গভীর ঘুমে অচেতন আর আমি জেগে আছি একা। স্বপ্ন দেখছি একটা নতুন দিনের যেদিনের শুধু আনন্দই থাকবে না, খানিকটা বেদনাও তার সঙ্গে শরিক হবে। সেই আনন্দ আর বেদনার সংমিশ্রণে সৃষ্টি হবে এক সর্বজনীন ভালোবাসা।

টঙ্গী, গাজীপুর থেকে

আরেক সুনন্দা

– বারী

১৯৬৩ সাল। কৈশোর ছাড়িয়ে যৌবনের হাতছানি শুরু। পাশাপাশি বাসা হওয়াতে ব্যাডমিন্টন খেলা, ছোটখাটো খুনসুটি, কলেজ ফাংশনে আসা–যাওয়ার মাধ্যমে এক ধরনের রোমাঞ্চের সূচনা।

নাইট কলেজে পড়ার কারণে রাত করে ঘরে ফেরার অভ্যাস ছিল। বাসায় না ফেরা পর্যন্ত রাত জাগা দুটি চোখ দোতলায় জানালার অপেক্ষারত দেখতাম। বুঝলাম, শুধু রোমাঞ্চই নয়, তার বাইরেও কোথাও কিছু ঘটে গেছে।

সব কিছু এলোমেলো হয়ে গেল যখন সে বললো, তার বাবা বিয়ে ঠিক করে ফেলেছেন এবং তাকে শিগগিরই চলে যেতে হবে। বিয়ে ঠেকাতে হলে আমাকেই কিছু একটা করতে হবে।

তখন গ্র্যাজুয়েটও হইনি। ফলে *শুধু চেয়ে চেয়ে দেখলাম*।

১৯৬৪ সালের ডিসেম্বরের এক বিকেলে ও চলে যাবার পর বুঝলাম জীবনের প্রথম প্রেম সফল এবং সার্থক না হলে তা জীবনকে কতোখানি পঙ্গু করে দেয়। সব সময় প্রথম সারিতে রেজাল্ট করা আমি বিকম–এ বাজে রেজাল্ট করলাম। বিমানের চাকরি, ব্যাংকের চাকরি কিছুই ভালো লাগলো না।

সব কিছু ছেড়ে–ছুড়ে ১৯৬৬–তে ইউনিভার্সিটিতে এমকম–এ ভর্তি হলাম।

আবার অপ্রত্যাশিতভাবে দেখা হয়ে গেল ইউনিভার্সিটির করিডোরে। সব কিছু শাদাসিধে। সেই উজ্জ্বলতা নেই, উচ্ছলতা নেই, আবেগ নেই। আলাপে বুঝলাম দাম্পত্য জীবনে সে সুখী নয়। ইউনিভার্সিটির দুই বছর অনেক কষ্টে নিজেকে সংবরণ করে তার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখতাম। হলের ভিপি হওয়া, ছাত্র রাজনীতি ইত্যাদিতে ব্যস্ত রইলাম। মাস্টার্স–এ ফার্স্ট হলাম।

ফার্স্ট হবার কারণে ইউনিভার্সিটিতেই জয়েন করার অফার পেলাম। কিন্তু ওই শহরে থাকলে তো ওকে ভুলে থাকা যাবে না। দুর্বার আকর্ষণের বন্যায় তার সংসারটাই তছনছ হয়ে যেতো।

সবার শান্তির জন্যই অলক্ষ্যে শহর ছাড়লাম। কিন্তু আমার শান্তি কোথায়? সে তো কবেই হারিয়ে গেছে।

১৯৬৮–তে ইউনিভার্সিটি ছাড়ার পর কখনো আর দেখা হয়নি, কোনো রকম যোগাযোগ তো দূরের কথা।

কিন্তু শীতের সন্ধ্যা, বিষণ্ন বিকেল আর শ্রাবণের রাত এলেই একটা না পাওয়ার বেদনা কেন জানি আমাকে তাড়া করে ফিরতো। অসহায় বোধ করতাম। আমার জীবনের এই অধ্যায়টুকুই কিছুটা খামখেয়ালির বশেই আত্মজিজ্ঞাসার মতো করে বিচিত্রার *কুরুক্ষেত্র* কলামে লিখেছিলাম ১৯৯০–এর আগস্টে সংক্ষিপ্ত নাম ঠিকানা দিয়ে।

কিভাবেই যেন লেখাটা তার চোখে পড়ে যায়।

আমি তখন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। *কুরুক্ষেত্র–এর* সংক্ষিপ্ত নাম ঠিকানার সূত্র ধরে সারা বাংলাদেশ তোলপাড় করে আমাকে খুজে বের করে ফোন করলো।

দীর্ঘ বারো বছর পর তার মধুর কণ্ঠ আবার শুনলাম।

পরের সময়টুকু আমার যাযাবরের কালজয়ী উপন্যাস *দৃষ্টিপাত*–এর সুনন্দা আর চারুদত্ত আধারকারের জীবনের হুবহু ছায়া যেনো। নিষ্কাম ভালোবাসা, সহমর্মিতা ও পারস্পরিক নির্ভরতায় কাটালাম আমরা পরের তেরো বছর। আরো জানতে পারলাম আমাদের যোগাযোগ বিহীন ছাব্বিশ বছর আমরা দুজনই দুজনকে পূজার বেদীতে অধিষ্ঠিত রেখেছিলাম।

অবিবাহিত আধারকার বিবাহিতা সুনন্দাকে মুম্বাই–এর রেল স্টেশনে দেখার পর যে সম্পর্কের সৃষ্ট হয় তা কখনোই পরকীয়া বা নষ্টপ্রেম ছিল না। আমাদের ভালোবাসাও কখনো অপবিত্রতার সীমারেখা লংঘন করেনি। তবুও তো প্রেম ভালোবাসা সহমর্মিতা আর পরম নির্ভরশীলতার এক অভূতপূর্ব অধ্যায় ছিল আমাদের। মান্না দে–র গানের কথায় বলতে গেলে *একি অপূর্ব প্রেম দিলে বিধাতা আমায়*।

দুই ভুবনের দুই বাসিন্দা রেললাইনের মতো পাশাপাশি সমান্তরাল চললাম।

২০০৩ সালে চাকরি থেকে আমার অবসর নেবার সময় এলো, সে সময় সবাই একটা বিষণ্ণতায় ভোগে। আমার ক্ষেত্রে তা হলো না। কারণ আমার রয়েছে তাকে ঘিরে রূপ, রস, গন্ধ ভরা বিপুলা পৃথিবী। তাকে নিয়ে ভাবলেই সারা দিনমান কেটে যায় রাত ভোর হয়ে দিন ফিরে আসে স্মৃতি রোমন্থর করে। কিন্তু তখনই এলো অপ্রত্যাশিত এক নিষেধের বেড়াজাল।

নিজের মুখেই বললো, আমি যেন তার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক না রাখি। কারণ তার সংসারে ঝড় উঠেছে আমাকে নিয়ে।

শাহাবুদ্দীন নাগরীর গানের ভাষায় বললো, *আসলেই ভালোবাসা ভাগ করা যায় না*।

সত্যিই তো স্বামীকে ভালোবাসার ভাগ আর কাউকে দেয়া যায় না, উচিতও নয়। আজও বুঝি না, তাহলে আমাকে সারা বাংলাদেশ তোলপাড় করে খুজে বের করা কেন? কেনই বা চল্লিশ বছর একে অপরকে ঘিরে স্বপ্ন লালন করা? সমস্ত অধ্যায়টুকুই ভীষণ দুর্বোধ্য লাগে আমার কাছে।

দৃষ্টিপাত–এর চারুদত্ত আধারকার অত্যন্ত ভাগ্যবান। তিনি সিনেমা হলের অন্ধকারে সবার অলক্ষ্যে তার সম্পর্কে তার দয়িতা সুনন্দার জঘন্য মন্তব্য শুনে নীরবে সরে গিয়েছিলেন সুনন্দার জীবন থেকে।

আমার *সুনন্দা* আমাকে চল্লিশ বছর পর নিজ মুখে বললো যে, তার পক্ষে আমার সঙ্গে আর ভালোবাসার অভিনয় চালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়।

এক হতভাগ্য মূর্খ আমি চল্লিশ বছর ধরে যে রক্ত মাংসের দেবীকে বেদীতে অধিষ্ঠিত করে পূজা করলাম, অবশেষে জানলাম সে এক নিরেট পাথরের টুকরো ছাড়া অন্য কিছুই নয়।

ঢাকা থেকে

বিপজ্জনক

– আহাম্মেদ হেলাল

আমি যে বিজ্ঞাপনী সংস্থায় কাজ করছি সেটারই মার্কেটিং বিভাগের দায়িত্বে আছে আবাদি। বিজ্ঞাপনী সংস্থার মালিকেরই ছেলে। শিক্ষিত ও ভদ্র ছেলে। অন্যান্য অনেক সউদি নাগরিকের মতো বিদেশিদের প্রতি বিন্দুমাত্র বিদ্বেষ নেই। এক কথায় খুবই চমৎকার একটি ছেলে।

আমার সঙ্গে তার বেশ ঘনিষ্ঠতা। প্রায়ই বিভিন্ন প্রসংগ নিয়ে আমার সঙ্গে আবাদির চলতো ঘন্টার পর ঘন্টা আড্ডা। এমন কোনো বিষয় নেই যা নিয়ে আমাদের মধ্যে আড্ডা হতো না। যে বিষয়টি নিয়ে আমার সঙ্গে আবাদি আলাপ করতে সবচেয়ে বেশি পছন্দ করতো সেটা হলো বাংলাদেশের ছেলেমেয়েদের প্রেম–ভালোবাসা বিষয়ে।

সে প্রায় সময়ই শুনতে চাইতো বাংলাদেশের ছেলেমেয়েরা যখন প্রেম করে তখন তারা উভয়ের সঙ্গে যোগাযোগ কিভাবে করে? একে অপরের সঙ্গে দেখা করার ব্যাপারে কি কি সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়?

আমাদের ওখানকার ছেলেমেয়েদের প্রেম–ভালোবাসার পরিণতি কি? এমনি নানান রকম জিজ্ঞাসার উত্তর দিতে দিতে অনেক সময় বিরক্ত হয়ে যেতাম। কিন্তু সেটা ওকে বুঝতে দিতাম না।

যদিও জানি সউদি আরবের কঠোর ইসলামি শাসন ব্যবস্থায় সউদি ছেলেমেয়েদের একে অন্যের সঙ্গে মেলামেশাটা অত্যন্ত কঠিন এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ তবুও আবাদিকে জিজ্ঞাসা করি ওর কোনো মেয়ে বন্ধু বা প্রেমিকা আছে কি না?

সে অকপটে বলে, আছে। বলেই সে বুঝতে পারে তার এভাবে বলাটা উচিত হয়নি।

আমি বুঝতে পেরে ওকে আশ্বস্ত করলাম। ওর ভয় পাছে ওর বাবা বা অন্য কাউকে বলে দিই কি না। কেননা এখানে দেখা যায়, বন্ধু–বান্ধবের সঙ্গে সব ব্যাপারে খোলাখুলি আলাপ আলোচনা চললেও যে কয়েকটি ব্যাপার সযত্নে এড়িয়ে চলে তার একটা হলো মেয়ে বান্ধবী বা প্রেমিকার ব্যাপারটা। কারণটা আমি কখনো আবাদির কাছে জানতে চাইনি। তবে অনুমান করতে পারি।

আবাদির প্রেমিকার ব্যাপারটা যখন আমার জানা হলো তখন ওকে নানান রকম প্রশ্ন করতাম।

কিন্তু আমার মতো ও কখনো বিরক্ত হতো না।

এক সময় ও ওর প্রেমিকা সম্পর্কে আমার সঙ্গে এতোটাই খোলামেলা হয়ে গেল যে, আমাকেও ওর প্রেমিকার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল মোবাইলে।

মেয়েটির নাম আয়েশা। আবাদির কাছ থেকে বাংলাদেশের ছেলেমেয়েদের প্রেম কাহিনী শুনে সেও শুনতে আগ্রহী। কিন্তু আমি আরবি ভালো বলতে না পারার কারণে তেমন বেশি কথা হতো না।

একদিন আবাদিকে জিজ্ঞাসা করলাম, তোমার বান্ধবীর সঙ্গে তুমি দেখা করো কিভাবে?

সে বললো, শপিং সেন্টারে।

তোমাদের এখানকার মেয়েরা তো বোরখা পরে চলাচল করে, শুধু চোখ দুটো বের করে রাখে। অনেকে আবার চোখও ঢেকে রাখে। আর যেসব শপিং সেন্টারের কথা বললে সেখানে তো মহিলা ক্রেতার সংখ্যাই বেশি। যেহেতু সবাই একই ধরনের কালো বোরখা পরে থাকে, সেখান থেকে তোমার বান্ধবীকে তুমি চিনতে পারো কিভাবে?

আবাদি বললো, চোখ দেখে।

এতে কি ভুল হবার সম্ভাবনা থাকে না?

একেবারে যে থাকে না তা নয়। তবে সে সম্ভাবনা খুব কম।

যদি তোমার বান্ধবী অন্যান্য অনেকের মতো তার চোখও ঢেকে রাখে তাহলে কি করো?

আবাদি বললো, এ রকম সাধারণত করে না। কারণ আমাদের এখানকার বেশির ভাগ ছেলেরা যেমন একজন মেয়ে বান্ধবী পাওয়ার জন্য ব্যকুল থাকে তেমনি ঠিক মেয়েরাও। ছেলেদের বাইরে যাওয়া–আসায় তেমন কোনো বিধি–নিষেধ না থাকলেও মেয়েদের বেলায় সেটার সুযোগ নেই বললেই চলে। আর মেয়েরা চুরি করে যে সামান্য সুযোগ বের করে সে সুযোগটা কোনো অবস্থায় নষ্ট করতে চায় না। তাছাড়া এ রকম ভুল হবার সম্ভাবনা থাকলে সেক্ষেত্রে মোবাইলই ভরসা।

এভাবে যদিও তাদের খুব বেশি সময়ের জন্য দেখা করার সুযোগ মেলে না তবুও আবাদি তাতেই খুশি। কোনো কোনোদিন আবাদির চেহারা দেখেই বুঝতে পারি আজ সে তার প্রেমিকার সঙ্গে দেখা করে এসেছে বা করতে যাবে।

শপিং সেন্টার ছাড়া আরেকটা জায়গা রয়েছে প্রেমিক প্রেমিকাদের দেখা করার জন্য। সেটা হলো, কোনো রেস্তোরায় ফ্যামিলি ক্যাবিন। কিন্তু সেটাতে একটু রিস্ক থেকে যায়।

তার মানে তুমি তোমার প্রেমিকার চেহারা এখন পর্যন্ত দেখতে পারোনি?

তা কেন হবে! অনেকবার দেখেছি এবং চুমুও খেয়েছি।

অবাক হয়ে জানতে চাইলাম, কিভাবে?

ওদের বাড়িতে। আয়েশার বাড়িতে যদি কখনো কেউ না থাকতো তাহলে সে মোবাইলে আমাকে জানিয়ে দিতো। বাড়িতে তো গেট দিয়ে ঢোকার উপায় থাকতো না। কারণ আয়েশার পরিবারের সদস্যরা যখন আয়েশাকে একা রেখে বাইরে যেতো তখন বাইরে থেকে তালা মেরে চাবি ওদের সঙ্গে নিয়ে যেতো। তখন চোরের মতো দেয়াল টপকে ওদের বাড়িতে ঢুকতে হতো।

এতে কোনো বিপদের সম্ভাবনা নেই?

বিপদের সম্ভাবনা শতকরা নব্বই ভাগ। যেকোনো সময় ওদের বাড়ির কেউ বা প্রতিবেশীদের কেউ যদি দেখে ফেলে তবে প্রাণ যাবারও সম্ভাবনা রয়েছে।

কি রকম?

যেকোনো সউদির কাছে লাইসেন্সড পিস্তল থাকাটা অতি সাধারণ ব্যাপার। আর কোনো সউদি যদি এই অবস্থায় গুলিও চালিয়ে দেয় তবে তাকে তেমন কোনো কঠোর জবাবদিহি করার প্রয়োজন হয় না। এবং যদি বাড়ির লোক হয় তবে তো কথাই নেই।

এমনি একটা ঘটনা ঘটেছে কিছুদিন আগে। ঘটনাটা আগে শুনেছিলাম, এখন আবার আবাদির কাছ থেকে শুনলাম।

ঘটনাটা এ রকম :

ছেলেটির নাম ইব্রাহিম। সউদি নাগরিকত্ব প্রাপ্ত ইয়েমেনি। একটা পেইন্ট কম্পানিতে কাজ করতো। তারই সহকর্মী ইসমাইল। সউদি নাগরিক। ইব্রাহিম আর ইসমাইল দুজনেই ঘনিষ্ঠ বন্ধু। হঠাৎ একদিন শুনতে পেলাম ইব্রাহিম খুন হয়েছে। আর খুনি তারই সহকর্মী বন্ধু ইসমাইল। কারণ হিসেবে জানা গেল, ইসমাইলের বোনের সঙ্গে ইব্রাহিমের প্রেমের সম্পর্ক। তারা নাকি অনেক দিন থেকেই মন দেয়া-নেয়া করছিল।

এখানকার বেশির ভাগ প্রেমের সূত্রপাত যেভাবে হয় সেভাবেই তাদের প্রেমের সূত্রপাত অর্থাৎ টেলিফোনে। একদিন ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে যায়। ইসমাইলও জানতে পারে ওর বোনোর সঙ্গে ইব্রাহিমের সম্পর্কের কথা। ফলাফল বন্ধুত্বে ফাটল। ইব্রাহিম প্রায়ই রাতে বা ইসমাইলদের পরিবারের অন্য সদস্যদের অনুপস্থিতির সুযোগে তার প্রেমিকার সঙ্গে দেখা করতো। এমনিভাবে এক রাতে ইব্রাহিম ওর প্রেমিকার সঙ্গে দেখা করতে এসে ইসমাইলের পরিবারের সদস্যদের হাতে ধরা পড়ে গেল। ধরা পড়ে গেলে ইব্রাহিম পরিণতির কথা ভেবে প্রথমে কিছুটা ভয় পেলেও ওর প্রেমকে অস্বীকার করেনি। সে সেখানে ইসমাইলের পরিবারের সব সদস্যের কাছে ওর ভালোবাসার কথা খুলে বললো এবং মেয়েটিকে বিয়ে করতে চাইলো। কিন্তু ইসমাইলের পরিবারের সদস্যেরা এতে বেশি রেগে যায় এবং সকলে মিলে ইব্রাহিমকে মারতে শুরু করে।

ইব্রাহিমের ওপর সকলের এমন অত্যাচার মেয়েটি সহ্য করতে পারেনি। সে দৌড়ে এসে ইব্রাহিমকে বাচানোর চেষ্টা করলো। মেয়েটিও চিৎকার করে বলছে, সেও ইব্রাহিমকে প্রচণ্ড ভালোবাসে এবং তাকে বিয়ে করতে চায়।

এতে ইসমাইলের পরিবারের সদস্যরা আরো রেগে যায়। এক পর্যায়ে ইসমাইল ঘরের ভেতর থেকে পিস্তল নিয়ে আসে এবং ইব্রাহিমকে গুলি করে। ইসমাইলের বোন ইসমাইলকে বাধা দিতে গেলে সে তার বোনকেও গুলি করে।

গুলির আওয়াজে প্রতিবেশীরা জড়ো হয়ে যায়। পুলিশ চলে আসে। দুজনকেই হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। হাসপাতালে পাওয়ার পথেই ইব্রাহিমের মৃত্যু ঘটে। ইসমাইলের বোন বেচে যায়। পরবর্তীকালে ইসমাইলের কি হয় তা জানা না গেলেও এটুকু জানা যায় যে, তাদের পরিবার এ শহর ছেড়ে অন্যত্র চলে যায়।

আবাদি বললো, সাধারণত এ ধরনের প্রেমের ঘটনা ধরা পড়ে গেলে মেয়েটি অস্বীকার করে বসে। ছেলে বেচারা ফেসে যায়। কিন্তু এখানে মেয়েটি তা করেনি। এ ব্যাপারে মেয়েটিকে বাহবা দিতে হয়।

ঘটনাটা শোনার পর আবাদিকে জিজ্ঞাসা করলাম, তোমার ক্ষেত্রের তো এ রকমটা হতে পারে?

আমার প্রশ্নটা শুনে আবাদির চেহারাটা বেদনায় ছেয়ে গেল এবং বললো, হয়তো হতে পারে। সে আরো বললো, আমাদের এখানকার প্রেম ভালোবাসার পরিণতি সব সময়ই নেগেটিভ এবং বিপজ্জনকও বটে। ভালোবেসে ভালোবাসার মানুষকে নিজের করে পাওয়া তো স্বপ্ন মাত্র। সব কিছু জেনে-বুঝেও আমরা ভালোবাসি, প্রেমে পড়ি। এদিক দিয়ে তোমরা বেশ ভাগ্যবান। তোমরা তোমাদের ভালোবাসার কথা প্রাণ খুলে প্রিয়জনকে বলতে পারো। দুজনেই আন্তরিক হলে প্রিয় মানুষটিকে নিয়ে ঘর বাধার স্বপ্ন দেখতে পারো। তোমাদের মতো আমাদেরও যে ভালোবাসতে ইচ্ছে করে, ইচ্ছা করে ভালোবাসা পেতে, ইচ্ছা করে ভালোবাসার মানুষটিকে নিয়ে ঘর বাধতে, আরো ইচ্ছা করে ভালোবাসা দিবসে ভালোবাসার মানুষটির হাতে একগোছা ফুল তুলে দিয়ে বলি, *শুধুই ভালোবেসো*। কিন্তু এসব তো আমাদের এখানে কেবল স্বপ্নেই সম্ভব হতে পারে। এবং সেই স্বপ্নের কথাও যদি কোনো *মতোয়া* (ধর্মীয় বিধি নিষেধ কেউ অমান্য করছে কি না তা যারা দেখাশোনা করে) শুনে তবে সে বলবে *হাদা* (এটা) হারাম।

সউদি আরব থেকে

তাবিজ

– মোহাম্মদ ফাহাদ

গভীর রাতের আকাশে ক্লান্ত গ্রহ-তারার চোখে ঘুম।

আমার চোখে ঘুম নেই কেন?

আমি ঢাকা জেলার অন্তর্গত দোহারের ছোট্ট গ্রাম উত্তর জয়পাড়ার এক দুরন্ত যুবক। তখন ক্লাস নাইনে পড়তাম। ওই বয়সে ছেলেমেয়েদের মনে অন্য রকম একটা সত্তা বাস করে।

আমাদের দেশের নিচু অঞ্চলের বর্ষাকালীন ঐতিহ্য হলো নৌকা বাইচ। এ নৌকা বাইচ নিয়েই আমার জীবনের রঙিন স্বপ্নের পদার্পণ।

নানাবাড়ি কাছে হওয়ায় মামাতো ভাইবোনদের সঙ্গে এক সঙ্গে বেড়ে ওঠা। হঠাৎ আমার মামাতো ভাই রনি এসে আমাকে বললো, রবিউল চল নৌকা বাইচ দেখতে যাবো।

সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেলাম।

সঙ্গে যেতে চাইলো ক্লাস সেভেন পড়ুয়া আমার মামাতো বোন সাথী। রনির-ই সহোদরা।

তখন রনির অমত সত্ত্বেও ওকে নিতে রাজি হলাম। ও যখন নৌকা বাইচে যাবার জন্য সাজলে এবং আমার সামনে এলো তখন যেন ওকে সম্পূর্ণ নতুনভাবে আবিষ্কার করলাম। আমার মনে হলো ওর মতো রূপ সৃষ্টিকর্তা আর কাউকে দেয়নি।

সেই থেকে ওকে ভালো লাগা এবং একতরফাভাবে ভালোবাসা। এ ভালোবাসার আবেগটা যে, আমার মনের গভীরে কখন স্থান নিল, বুঝতে পর্যন্ত পারিনি। তখন থেকে আমার মনে ওর জন্য তৈরি হয়েছে ভালোবাসার ছোট্ট একটি ঘর। কিন্তু মুখ ফুটে ওকে ভালোবাসার কথা বলতে পারিনি। কারণ ওকে কথাটা বলতে আমার প্রচণ্ড লজ্জা বোধ করছিলাম। তারচেয়ে বেশি ভয়ও করছিল বটে।

তাই মনের ব্যাকুল কথাটা বলার জন্য ঠিক করলাম খালাতো বোনকে।

কিন্তু সেখানে ঘটলো আরেক বিপত্তি। কারণ খালাতো বোন আমাকে জানালো সাথীকে আমারই বড় ভাই বিয়ে করতে চায়।

আমার খালাতো বোনকে বললাম, তাহলে আমি কি করতে পারি?

সে আমাকে ওই পথ থেকে ফেরার জন্য ঘটনাটি আমার নানাবাড়ি এবং আমাদের বাড়ির সকলকে জানিয়ে দিল।

বুঝতে পারলাম তার কাছে বলাই ছিল আমার জীবনের বড় ভুলগুলোর একটি।

এই ঘটনার পর আমার ও আমার মামার পরিবারের সবাই আমাকে এড়িয়ে চলতে লাগলো। সেটা বুঝতে পেরে মামাবাড়ি যাওয়া কমিয়ে দিই।

এর কিছু দিন পরে সাথী মানে আমার মামাতো বোনের সোয়েটারের পকেটে একটি তাবিজ পাওয়া যায়।

আমার মামা আমাকে সন্দেহ করে আমার মায়ের কাছে কথাটি জানালেন, যে, আমি সাথীকে তাবিজ-কবজ করে বশে আনার চেষ্টা করছি।

আমার মা বিশেষ বুদ্ধি করে আমাকে বলেন, আমার কোরিয়া প্রবাসী বড় ভাইয়ের সঙ্গে সাথীর বিয়েতে আমার আপত্তি আছে কি না।

বললাম, সাথীর সঙ্গে বড় ভাইয়ের বিয়েতে আমার কেন আপত্তি থাকবে? আমার বড় ভাইকে এতো ভালোবাসি এবং শ্রদ্ধা করি যে, তার জন্য জীবনও দিয়ে দিতে পারি।

সাথীর সঙ্গে সম্পর্ক করার চেষ্টার ও তাবিজ-কবজের কথা আমার মা তোলেন। তাবিজ-কবজের কথায় চটে গেলাম। কারণ আমি এবং আমার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ সে তো জানে এ ঘটনার সঙ্গে আমি জড়িত নই। তারপর রাগে ও ক্ষোভে আমার দীর্ঘ দিনের সাধনার ফসল সাথীকে নিয়ে লেখা বায়ান্নটি কবিতাসহ ডায়রি আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ফেললাম। মোট কথা, সাথীর সকল স্মৃতি আমার কাছ থেকে মুছে দিলাম।

পরবর্তীকালে তাবিজ-কবজ, আমার শ্রদ্ধেয় বড় ভাই এবং সাথীর চিন্তা-ভাবনায় আমার পড়াশোনার বেশ ক্ষতি হয় এবং এক পর্যায়ে এসএসসি পরীক্ষা দেয়া হলো না আমার। তখন আমার মনটা আরো ভেঙে যায়।

তারপরও শত চেষ্টা করেও ওকে ভুলতে পারিনি। সাথীকে ভুলতে গিয়ে কখন যেন আমার অজান্তে নেশার জগতে ঢুকে গেলাম।

এখন নিয়মিত নেশা করি।

পরে অবশ্য সাথীকে বিয়ে করতে আমার বড় ভাই অস্বীকৃতি জানান। কিন্তু তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। সাথী আমার জীবন থেকে অনেক দূরে চলে গেছে।

একটা কথা পাঠকদের জানা দরকার যে, পরবর্তীকালে প্রমাণ হয়েছিল যে, ওই তাবিজটি আমি দিইনি, ওটা আমার মানসিক রোগী খালাতো ভাই রেখেছিল।

দোহার, ঢাকা থেকে

তথাকথিত

ভালোবাসা! তথাকথিত ভালোবাসা (দুঃখিত পাঠক! শব্দটির এমন ব্যবহারের জন্য)-র অনুভূতি এই মেয়েটির কাছে কি? লেখাটি পড়ে আপনারাই বলুন।

কোনো এক পড়ন্ত বিকেলে মেয়েটি যখন একান্ত আনমনে ফেলে আসা অতীত, অনাগত ভবিষ্যত আর মাঝখানের এই বর্তমানটুকুকে নিয়ে তার এলোমেলো ভাবনাগুলো সাজাতে ব্যস্ত তখনি কোলের ওপর রাখা মোবাইল ফোনটি বেজে উঠলো।

অচেনা নাম্বার - ছোট্ট একটা SMS (Hi!)।

অন্যসব SMS বা ফোনের মতো ঘটনার শেষ যদি উত্তর বিহীন নিস্পৃহতা দেখে থেমে যেতো তবে আজ অন্তত মেয়েটিকে এই দীর্ঘশ্বাস বয়ে বেড়াতে হতো না।

তথাকথিত সেই ভালোবাসার কয়েক সপ্তাহ ছিল এ রকম :

প্রথম সপ্তাহ : Can we be friends only by SMS?

দ্বিতীয় সপ্তাহ : Can we be...?

তৃতীয় সপ্তাহ : Love you. Love you so much.

তুমি আমার স্বপ্নে আছো সারাক্ষণ।

মাঝখানের দীর্ঘ কথোপকথন, নির্ঘুম রাত জাগা শব্দ চয়ন, প্রেমময় আকুলতা আর মোহময় স্বপ্নজালে একটু একটু করে আবিষ্ট করে তোলা, সীমাবদ্ধতার কারণে তুলে ধরা সম্ভব হলো না।

শেষ সপ্তাহ : Sorry! আমি সত্যিই দুঃখিত। বাবা–মায়ের পছন্দ করা পাত্রীকে বিয়ে করতে হচ্ছে। Please! Control yourself.

এরপর (একটা দীর্ঘশ্বাস আর মেয়েটির একান্ত অনুভূতি) ভালোবাসা!

সুমন, এই যদি হয় তোমার ভালোবাসার ব্যাপকতা তবে চাই না এই ভালোবাসা। সত্যিই চাই না।

নাম ঠিকানা বিহীন

nazneen_deeba@yahoo.com

সাংবাদিক বন্ধু

১৯৯৮ সালের আগস্টের কথা। ঢাকা থেকে বাড়ি ফিরছি। সদরঘাট এসে *মাসিক টেলিভিশন*–*এর* এক কপি হকারের কাছ থেকে কিনলাম। ক্যাবিনে গিয়ে ফ্রেশ হয়ে পত্রিকা নিয়ে বসলাম। পত্রিকার পাতায় চোখ রাখতেই চোখে পড়লো একটি ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপন।

সেটা ছিল এ রকম : *কলকাতা থেকে সাংবাদিকতার উপর ডিগ্রি নিয়ে দেশে ফিরেছি, একজন জীবন সঙ্গী খুজছি... ।*

বাড়িতে এসে তার ঠিকানায় চিঠি পাঠালাম।

এক মাস পর কুরিয়ারে তার একটি উত্তর পেলাম।

এরপর আমিও লিখলাম।

লেখা আর পাল্টা লেখায় চার–পাচ মাস কেটে গেল। ভীষণ বন্ধুত্ব হলো দুজনার মধ্যে।

হঠাৎ একদিন ছবি চেয়ে বসলো ছেলেটি।

কিন্তু এতো দিনে তাকে দেখার ইচ্ছা আমার একবারও হয়নি। চেহারা দেখে বন্ধুত্ব বিচার করার মানসিকতা আমার কখনোই ছিল না। তাকে ছবি পাঠালাম। তবে একটু কৌশল করে। ছবির মাঝ বরাবর কেটে অর্ধেকটা তাকে পাঠালাম। সত্যি কথা বলতে কি, আমি চাচ্ছিলাম না সে আমার অসুন্দর চেহারাটা দেখুক।

প্রতি সপ্তাহে তার চিঠি পেতাম – আমিও লিখতাম।

১৯৯৯–এর একুশের বইমেলায় যাবার জন্য আমন্ত্রণ করলো এবং আমাকে একটা বই পাঠালো।

এরই মধ্যে এসে গেল আমার এইচএসসি পরীক্ষা। শেষও হলো।

চিঠি এলো তার। সে কলকাতা যাচ্ছে পাচ মাসের জন্য আরেকটি কর্মশালায় অংশগ্রহণের জন্য।

তাকে আশির্বাদ দিয়ে লিখলাম।

এখানে বলা ভালো, এতো দিনের চিঠি লেখায় আমাদের মাঝে প্রেম, ভালোবাসা জাতীয় কোনো সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি। আমরা ছিলাম একে অন্যের বন্ধু, শুধুই বন্ধু।

কলকাতা গিয়ে চিঠি লিখলো যে, কলকাতার শুভার্থীরা তোমায় দেখতে চায়, একটি ছবি পাঠাও।

এবার ছবি পাঠালাম একটু অন্যভাবে। আমার মুখমণ্ডলের ছবি কেটে।

সেও ছবি পাঠালো কলকাতা থেকে। দেখলাম আমার বন্ধুকে।

সে সুন্দর কি অসুন্দর সে বিচার আজ করবো না।

তবে পরের চিঠিতে সে আমার ছবিটা পাঠিয়ে দিয়েছিল এবং লিখেছিল ছবিটা নেয়া গেল না বলে দুঃখিত।

অপমানিত হলাম।

১৯৯৯-এর নভেম্বর মাসে তার দেশে ফেরার কথা।

অক্টোবরে ঢাকা গেলাম ভাইয়ের বাসায় বেড়ানোর উদ্দেশ্যে। ঢাকা গিয়ে তাকে ফোন করলাম তার দেয়া ঢাকার ফোন নাম্বারে। সে আগেই জানিয়েছিল এটা তার খালার বাসার ফোন নাম্বার এবং ঢাকায় অবস্থান করলে সে এখানেই থাকে।

জানলাম সে ফেরেনি।

এরপর খালার বাসা থেকে ফুপুর বাসা ঘুরে ঘুরে ভুলে গেলাম তার দেশে ফেরার কথা। ঢাকা থেকে আসার আগে আবার ফোন করলাম। জানলাম সে দেশে ফিরেছে দুই দিন আগে এবং তার গ্রামের বাড়ি শরীয়তপুর চলে গেছে।

আমিও গ্রামে চলে এলাম।

বাড়িতে এসে কুরিয়ারে তার একটি চিঠি পেলাম। তাতে লেখা ছিল আপনি আর না লিখলেই খুশি হবো।

অবাক হয়ে গেলাম! কি অপরাধ আমার? দ্বিতীয়বার অপমান বোধ করলাম। আর লিখলাম না। কিন্তু এতো দিনের বন্ধুত্বকে কি একটি কাথায় শেষ করে দেয়া যায়?

সে ছিল আজকের কাগজের সাংবাদিক। *আজকের কাগজের* ট্যাবলয়েড *কাগজ পাঠক*-এ তাকে নিয়ে একটি লেখা লিখে পাঠালাম *ছেলেটা সাংবাদিক* শিরোনামে।

মে মাসে কাকতালীয়ভাবে আমার বিয়ে হয়ে যায় এক প্রবাসীর সঙ্গে। স্বামী আমার স্বর্গের দেবতা। আগে জানতাম মেয়েরাই কেবল সুন্দরী হয়, তাদের নিয়ে কাব্য-কবিতা হয়। কিন্তু পুরুষরাও যে সুন্দর হয় তা তাকে দেখেই বুঝলাম। তার সৌন্দর্য লেখায় উঠিয়ে আনা আমার দুর্বল লেখনীর পক্ষে সম্ভব না।

ঘুরে ঘুরে তার ছুটি ফুরিয়ে যাচ্ছিল দ্রুত। স্বামীর সঙ্গে ঢাকায় গেলাম দুবার। কিন্তু বন্ধুর কথা মনে হলো না।

একদিন বিকালে স্বামীকে নিয়ে ঘুরতে বের হলাম রাস্তায়।

আমার এক বন্ধু বললো, সকালে আজকের কাগজে তোর একটা লেখা পড়লাম, খুব সুন্দর লিখেছিস।

মফস্বল শহর। দুই তিনটা দোকানে পত্রিকা বিক্রি করা হয়। খুজলাম সেসব দোকানে। কিন্তু বিকেল হয়ে যাওয়ায় পেলাম না।

অবশেষে বিকেলে এক কাকার বাসা থেকে পেপারটি সংগ্রহ করলাম। আমি পড়লাম এবং স্বামীকেও দেখালাম।

সে দেখলো কিছু বললো না।

আগেই আমার স্বামীকে সাংবাদিকের লেখা চিঠিগুলো দেখিয়েছিলাম। এবং তার সঙ্গে আমার বন্ধুত্বের কথা বলেছিলাম।

রাতে আমরা দুজন বসে বাদাম খাচ্ছিলাম এবং গল্প করছিলাম। আমার স্বামী বেচারা পেপারে কখন যে সেই বাদামের খোসা মুড়ে বাইরে ফেলেছে টের পাইনি। পেপারটা গোছাতে গিয়ে দেখলাম কাগজটা ছেড়া।

সে বললো, বাইরে ফেলে দিয়েছি।

কষ্ট পেলাম লেখাটা সংগ্রহে রাখতে পারলাম না বলে। জুন মাসের প্রচণ্ড বৃষ্টিতে কাগজটা মাটির সঙ্গে মিশে গেছে।

লেখাটা প্রকাশের দুই দিনের মাথায় সাংবাদিকের চিঠি এলো। *তোমার আজকের কাগজের লেখাটা পড়লাম...*। আমাকে সে আবার লেখার আমন্ত্রণও জানালো।

স্বামীর চলে যাওয়ার দিন খুব কাছে চলে এলো। আবার ঢাকায় গেলাম স্বামীর সঙ্গে।

সে চলে গেল প্রবাসে।

চোখের জলে তাকে বিদায় জানালাম।

এবার ভাবলাম সাংবাদিককে খুজে বের করবো এবং আমার বিয়ের কথা জানাবো।

এক খালাতো বোনকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম সাংবাদিকের ঠিকানা নিয়ে। প্রায় দুই ঘন্টা খোজার পর তার বাসা পেলাম।

বলা প্রয়োজন, ঠিকানাটা ছিল কাজিপাড়ার এবং আমি উঠেছিলাম মিরপুরে। মিরপুর থেকে কাজিপাড়ায় রিকশা ভাড়া সাত আট টাকা মানে দূরত্বটা খুব বেশি নয়। তাই সাংবাদিককে খোজার দুঃসাহস হয়েছিল আমার।

বাসায় ঢুকে এক ভদ্রমহিলাকে দেখলাম। জিজ্ঞাসা করলাম তার কথা।

সে মহিলা জানালেন, সে পাশের রুমে ভাড়া থাকে।

দেখলাম একজন ব্যাচেলরের সংসার। খুব গোছানো তার রুমটি। মহিলাকে জিজ্ঞাসা করলাম, সে বাসায় নেই? কখন ফিরবে?

সন্ধ্যা হয়ে আসায় দেরি করতে পারছিলাম না। তাই চলে আসতে হলো। এবং আসার সময় মহিলাকে বলে এলাম, সাংবাদিক ফিরলে তাকে বলবেন, আমি রাতে তার খালার বাসায় ফোন করবো, সে যেন সেখানে থাকে।

রাতে ফোন করলাম। পেলাম সাংবাদিককে।

কিন্তু এমনভাবে সে আমার সঙ্গে কথা বললো, মনে হলো সে আমাকে চেনেই না।

খুব লজ্জা পেলাম। কোনো কথাই বললাম না। ফোন রেখে দিলাম।

কিছু দিন ঢাকায় থেকে বাড়িতে এলাম। বাড়ি এসে দেখি তার একটি কুরিয়ার। *তোমাকে ফোনে ক্লান্ত মনে হয়েছে। কিন্তু কেন? পাশের রুমের ভাবী তোমার খুব প্রশংসা করেছে। প্লিজ তুমি আমার কাছে আরেকবার লিখো।*

মনে মনে বললাম, ভণ্ড।

আর যোগাযোগের চেষ্টা করিনি।

২০০১ সালে তার বিয়ের কার্ড পাঠিয়ে দিয়েছে।

কিন্তু আমার মনে হলো, এতো পরিহাসের প্রয়োজন কি? স্বামী এবং এক সন্তানসহ খুব সুখে আছি। সে কেমন আছে জানি না।

নাম ও ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক

বিভীষিকার রাত

আমরা দুজন পাচ বছর প্রেম করার পর বিয়ে করেছি। খুবই সংগোপন ছিল আমাদের সম্পর্ক। দেখা হতো বছরে দুই একবার। ফোন ও চিঠিই ছিল আমাদের যোগাযোগের মাধ্যম। অনেক চড়াই-উৎড়াই পার হয়ে অবশেষে উভয় পক্ষের অভিভাবকের সম্মতিতে আমাদের বিয়ে হলো।

বিয়ের কিছুদিন পর শবে মেরাজের রাতে এক দরবার শরিফে গিয়েছিলাম বাৎসরিক ওরস মোবারকে। মিলাদ মাহফিল শেষ হবার পর আমরা বাসায় যাবার জন্য বিদায় নিলাম।

হুজুর আমাদের বলেছিলেন, ইচ্ছা হলে থাকতে পারি। যদি না থাকি তবে যেন বাসায় চলে যাই।

রাত বারোটা বাজে। রাস্তায় এসে ভাবলাম, আমার দূরসম্পর্কের মামাতো বোন বন্যার বাসায় বাকি সময়টা কাটিয়ে সকালে চলে যাবো।

গেইটে কলিংবেল দিতেই ত্রিশ বত্রিশ বছরের একটি ছেলে, দেখতে ফর্শা, স্বাস্থ্য খুবই ভালো, তেমন লম্বা নয়, তালা খুলে দিয়ে ঝড়ের বেগে উপরে দোতলায় চলে গেল। লোকটিকে চিনলাম না আমি। হয়তো ওর কোনো আত্মীয় হবে।

বন্যা দরজায় দাড়িয়ে আছে। ওর মুখটা কেমন ফ্যাকাশে দেখাচ্ছিল। আমার স্বামীর সঙ্গে ওকে পরিচয় করিয়ে দিলাম। ও আমার বেশ ছোট হলেও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল আমাদের। খুব অল্প বয়সে ওর বিয়ে হয়েছে এবং দুটি মেয়ে আছে।

আমরা বললাম, রাতে খেয়ে এসেছি তাড়াতাড়ি ঘুমানো দরকার।

বন্যা ব্যবস্থা করে দিল। বাচ্চা দুটো আমাদের সঙ্গে ঘুমাবে।

কি জন্য যেন বন্যার রুমে গেলাম। সেই ছেলেটিকে দেখলাম ওর খাটে বসে টিভি দেখছে। ইশারায় জানতে চাইলাম কে?

বন্যা ঠোটের কোণে কেমন ফ্যাকাশে একটি হাসি দিয়ে উত্তর দিল, আমার হাজব্যান্ড। এ্যানির পাপার সঙ্গে টাকা পয়সা নিয়ে আমার ঝামেলা হবার পর আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। তারপর আমার দাদি ওর সঙ্গে আমার বিয়ে দিয়েছেন।

ওর কথা শুনে আমার চোখ দুটো কপালে ওঠে গেল। যেন বাকরুদ্ধ হয়ে গেলাম। এ্যানির বাবা খুবই ভালো এবং ভদ্রলোক ছিলেন। এতো বছরের সংসার, দুটি বাচ্চা। তারপরে বলে কি? এসব কি হলো?

ঘুমোতে চলে গেলাম। এতো রাতে এসেই যখন পড়েছি, বাইরে যাওয়া ঠিক হবে না। আমরা দুজন শুয়ে একটু একটু কথা বলছি। পাশের রুমে বেশ তর্ক-বিতর্ক ও গালাগালের শব্দ শুনতে পাচ্ছি। পাছে আমার হাজব্যান্ড শুনে ফেলে সেই ভয়ে জোরে জোরে কথা বলতে লাগলাম।

কিন্তু ও ঘরের শব্দ ক্রমেই ঘর ছেড়ে বাইরে আসতে লাগলো। বন্যার কান্নার শব্দ শুনছিলাম। একটু পর বুঝতে পারলাম লোকটি আমাদের নিয়ে নানান রকম অশালীন কথা বলছে এবং অকথ্য ভাষায় গালাগাল করছে বন্যাকে।

ও উচু স্বরে বলছিল, আমি বিশ্বাস করি না ওরা স্বামী-স্ত্রী, ঢাকা শহরে এমন বহু ঘটনা আমার জানা আছে। মিথ্যা পরিচয় দিয়ে এসে রাত কাটায়। *আমি দুইডারে শেষ কইরা দিমু। অগো রুম থাইকা বাইরে আইতে ক* ইত্যাদি।

কথাগুলো শুনে আমার বুকের ভেতরটা দুমড়ে-মুচড়ে উঠলো। গলা শুকিয়ে গেল। টয়লেটে যাবার কথা বলে ওদের রুমে গিয়ে খুব স্বাভাবিকভাবে জিজ্ঞাসা করলাম, কি রে বন্যা, কি হয়েছে? ঝগড়া করছিস কেন? আমরা আসাতে কোনো সমস্যা হয়েছে?

বন্যা হাউমাউ করে কাদতে লাগলো এবং বললো, আপা ও বিশ্বাস করছে না আপনারা স্বামী-স্ত্রী।

এ কথা শুনে আমার শরীর কাপতে লাগলো। তারপরও স্বাভাবিকভাবে বললাম, এসব কি বলছেন? তিন মাস আগে আমাদের বিয়ে হয়েছে। আমার হাজব্যান্ড ডিফেন্সে চাকরি করে। ক্যান্টনমেন্টে আমরা বাসা পেয়েছি। তাছাড়া আমাদের দেখে কি বুঝতে পারছেন না আমরা মিথ্যা কথা বলছি না?

লোকটি এখন আরো ক্ষেপে উঠলো, *তোরা স্বামী-স্ত্রী তার কি প্রমাণ আছে? বেশি কথা কবি না তাইলে দুইডার হাড্ডি এক কইরা ফালামু। আমার সঙ্গে বাটপারি? এমন বাটপারি বহু দেখছি। আমার পিস্তলটা দে, ফিনিশ কইরা ফালামু।*

দৌড়ে পাশের রুমে গিয়ে আমার স্বামীকে বললাম, তাড়াতাড়ি ওঠো। আমাদের ভীষণ বিপদ। এখানে থাকা যাবে না।

ও তাড়াতাড়ি ওঠে পাজামা-পাঞ্জাবি পরে নিল।

আমি বন্যাকে গেট খুলে দিতে বললাম।

বন্যা কাদছে।

আবারও বললাম, গেট খুলে দে।

বন্যা বললো, চাবি ওর স্বামী লুকিয়ে রেখেছে।

এ কথা শুনে আমার গলা এমনভাবে শুকাতে লাগলো, গ্লাসের পর গ্লাস পানি খাচ্ছি। কিন্তু কিছু হচ্ছে না।

লোকটি তখন বলছিল, *আমি আমার বসকে খবর দিতেছি, ওর গ্রুপ আইলে দেখিস তোদের অবস্থা কি হয়।*

আমার হাজব্যান্ডের মুখ চোখ শুকিয়ে গেছে।

সেও ওকে বোঝাতে চেষ্টা করছে, দেখুন, আপনি আমাদের কথা বিশ্বাস করুন, আমাদের সঙ্গে হুজুরের বাসায় চলুন, আমার অফিসেরও বাসার ঠিকানা নিন। হুজুর নিজে আমাদের বিয়েতে ছিলেন। চলুন, আমাদেরকে ওখানে নিয়ে চলুন। আপনার পাশের রোডেই বাসা।

লোকটি বললো, *তোদের কোথাও যেতে দেবো না। আমি এসআই ভাইকে ফোন করছি, তোদেরকে থানায় দিয়া দিমু*।

ওর কথা শেষ না হতেই বললাম, ঠিক আছে, আমাদের থানায় দিয়ে দিন, তবু আমাদের মারবেন না।

আমি শুধু আমার স্বামীকে আড়াল দিয়ে দিয়ে হাটছি। বন্যাকে ফিশ ফিশ করে বললাম, ও যেন আমার স্বামীকে না মারে।

বন্যার পাশের ফ্ল্যাটে ওর বড় ভাই উৎপলের বৌ বাচ্চা থাকে। তিন তলায় ছোট ভাইয়ের বৌ ও ভাড়াটিয়া রয়েছে।

আমরা সবার দরজায় গিয়ে বেল টিপলাম, ধাক্কালাম। ভাবী, আমাদের বাচান, দরজা খুলুন।

কিন্তু কেউ দরজা খুললো না। মনে মনে শুধু আল্লাহকে ডাকছি। ঘন ঘন পানি খাচ্ছি আর কাদছি।

আমরা যতোই অনুনয়-বিনয় করছি, পশুটার তর্জন-গর্জন ততোই বেড়ে যাচ্ছে।

বন্যা হাতে-পায়ে ধরে যখন ওকে নিবৃত করতে ব্যর্থ তখন বুদ্ধি করে ওই এলাকার কমিশনারকে ফোন করলো। তাড়াতাড়ি তাকে আসতে অনুরোধ করলো।

দুই তিনবার ফোন করার পর তিনি এলেন।

কমিশনার সাহেবকে দেখে আমার সর্বাঙ্গ থেকে একটি গরম হাওয়া বেড়িয়ে গেল।

তিনি আমাদেরকে দেখে, আমার কথা শুনে লজ্জিত হলেন এবং বন্যার স্বামী আইনদ্দীর ওপর হালকা রাগ করলেন। সব কিছু শুনে কমিশনার সাহেব আমাদেরকে হুজুরের বাসায় নিয়ে যেতে রাজি হলেন।

কিন্তু আইনদ্দী তারপরও আমাদের দুজনকে ভিন্ন ভিন্ন রুমে নিয়ে শ্বশুরবাড়ির ঠিকানা, শ্বশুর-শাশুড়ির নাম লেখালেন।

আমরা যখন হুজুরের বাসায় পৌছালাম, বাইরে অনেক ভক্তবৃন্দ বসে আছেন। তাদের দেখে কেদে ফেললাম এবং সব বললাম।

এখানকার অবস্থা দেখে ওরা পেছন থেকে কেটে পড়েছে।

দরবারে বসে কাদতে লাগলাম। আজ নতুন জীবন পেয়েছি এবং আমার স্বামী কি ভাববে ইত্যাদি মনে করে।

আধঘন্টা পর বন্যা ওর স্বামীকে নিয়ে দরবারে এসে আমাকে ডাক দিলে চমকে উঠি।

ওরা দুজন দরবারে এসে পীর সাহেবের পায়ে পড়ে গেল এবং সকলের কাছে ক্ষমা চাইতে লাগলো।

বিশেষ করে আমাকে সে বার বার বলতে লাগলো, আমার ভুল হয়ে গেছে আপা, আপনি আমার বড় বোন, আমাকে ক্ষমা করে দেন।

পরে জানতে পারলাম আইনদ্দী ওই মহল্লার দুর্ধর্ষ এক ক্যাডার। বন্যা একটা কাজের জন্য ওর কাছে গিয়ে ফেসে গেছে।

এ্যানির বাবা ফেরেশতার মতো মানুষ। তাকে ডিভোর্স দিয়ে ওই সন্ত্রাসীকে বিয়ে করে এখন দুর্বিষহ জীবন যাপন করছে। প্রতিনিয়ত শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। তারপরেও এ দুঃসহ জীবন থেকে বেরিয়ে আসার কোনো পথ নেই।

হয়তো ওই পশুটার হাতে নৃশংস মৃত্যুই হতে পারে ওর শেষ পরিণতি।

নাম ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক

বিয়ের কার্ড

– কমল শাহারিয়ার

প্রতিদিনের মতো আজও বসে আছি ও আসবে বলে। স্কুল ছুটি হয়েছে। দল বেধে মেয়েরা চলে যাচ্ছে। কিন্তু ও এখনো আসছে না। অপেক্ষা করা সত্যি কষ্টকর! এই নিত্য কষ্টকর ব্যাপারটি গত এক বছর যাবৎ করে আসছি।

দোকানদার ছেলেটার সঙ্গে কথা বলছিলাম, হঠাৎ ও বলে উঠলো, কমলভাই চলে যাচ্ছে তো।

রাস্তায় নেমে পড়লাম। পিছু পিছু হাটছি। খুব কাছাকাছি চলে আসলাম।

তানিয়া একটু কথা শোনো।

কোনো জবাব পেলাম না। আবার বললাম, প্লিজ, আমার কথা শোনো, আমি তোমাকে ভালোবাসি তানিয়া, সত্যিই ভালোবাসি। তুমি বোঝার চেষ্টা করো। প্লিজ, আমাকে আর কষ্ট দিও না।

ও হেটে চলছিল। কথা শেষ হতে উত্তর দিল, কমলভাই, আপনাকে তো বলেছি, আমি এখন আপনাকে ভালোবাসি না। শুধু শুধু কেন ডিস্টার্ব করেন? আপনি আর এ সময় এখানে আসবেন না। যদি আসেন, আমি আপনার আম্মুকে বলবো।

হঠাৎ করে দাড়িয়ে গেলাম রাস্তার দিকে কিছুক্ষণ এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলাম ওর যাওয়ার পথ চেয়ে। একটিবারও পেছন ফিরে তাকালো না। নিজেকে খুব অসহায় মনে হতে লাগলো। ভাবছি আর কতোদিন এভাবে ওর পিছু হাটবো। ওতো কখনো আমাকে আগের মতো ভালোবাসবে না।

বছর দুয়েক আগের স্মৃতিগুলো মনের ক্যানভাসে ভেসে উঠছিল। একটা সময় ছিল যখন ও আমাকে প্রচণ্ড রকম ভালোবাসতো। কিন্তু গত বছর আমার এসএসসি পরীক্ষার সময় পড়ার চাপে ওর কোনো খোজ নিতে পারিনি। তাই গেল একটি বছর যাবৎ আমাকে এভাবেই দাড়িয়ে দাড়িয়ে রাস্তার ঘাস বড় হওয়া দেখতে হয়।

গত কিছু দিন ওর পথে যাইনি। যাবোই বা কেন! প্রতিদিন একই কথা, একই উত্তর, আর কতো ভালো লাগে। তাই ঠিক করলাম কখনোই ওর পথে যাবো না। ওর যখন আমাকে ছাড়া চলছে তখন আমার কেন ওকে ছাড়া চলবে না?

কিছু দিন পর।

ভাইয়া, তানিয়াআপু তোমাকে বিকেলবেলা ওর প্রাইভেট টিউশনে যাওয়ার সময় একটু দেখা করতে বলেছে।

ছোট বোন মারফত বার্তা পেয়ে গেলাম দেখা করতে।

প্রথমে ও বললো, কেমন আছেন?

ভালো, তুমি কেমন আছো?

খুব একটা ভালো নেই। সেদিনের কথাগুলোতে কি রাগ করেছেন?

কই না তো! রাগ করবো কেন? এ রকম তো তুমি প্রতিদিনই বলো।

তা বটে। তবে এ কয়দিন আসলেন না যে।

আসিনি। ভালো লাগেনি। মন চায়নি। তাই আসিনি।
আগে মন চাইতো, এখন আর মন চায় না, তাই না?
হ্যা।
এ রকম হলো কেন?
জানি না। কেন ডেকেছো?
এমনিতেই, ভাবলাম অসুখ করলো কি না।
দেখলে তো অসুখ করেনি, এখন আসি।
চলে আসবো ঠিক এ রকম সময় সে ডাকলো, কমলভাই শুনুন।
আবার পেছন ফিরে গেলাম।
আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বললো, এই কার্ডটা রাখুন, আমার বিয়ের কার্ড। আপনাকে আসতে হবে। না এলে খুব কষ্ট পাবো।
ওর মুখ থেকে কথাগুলো শুনে খুব অবাক হলাম। বুকের বাম দিকটায় একটা চিনচিন ব্যথা অনুভব করলাম। কি উত্তর দেবো ভেবে পাচ্ছিলাম না। বুঝতে পারলাম, চোখ থেকে দু ফোটা কি যেনো পড়ল।
ও আমার এ অবস্থা দেখে অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে নীরবতা ভেঙে বলে উঠলো, আমি আসি। আপনি আসবেন।
চলে গেল দ্রুত হেটে।
সপ্তাহ খানেক পর আবার দেখা।
আপনি এলেন না কেন?
প্রশ্নটা এমনভাবে করলো, খুব ভয় পেয়ে গেলাম, অবাকও হলাম।
আমার কি কোথাও আসার কথা ছিল নাকি? মনে পড়ছে না তো? নিচু স্বরে উত্তর দিলাম। কোথায়?
কোথায় মানে? আপনি কার্ডটা পড়েননি।
না, পড়িনি।
কেন পড়েননি?
এবার একটু সাহস নিয়ে বললাম, তোমার বিয়ের কার্ড দিয়েছো আমাকে, সেটা কি আমার পক্ষে পড়া সম্ভব?
কেন সম্ভব না। ওটা বিয়ের কার্ড ছিল, নাকি অন্য কিছু ছিল সেটা দেখা সময় কি আপনার হয়ে ওঠেনি?
খুব লজ্জা পেলাম। ভাবছি, এতো বোকা হলাম কেন? তবুও নিজের পক্ষে যুক্তি দাড় করালাম। কিন্তু তুমি তো বললে, ওটা তোমার বিয়ের কার্ড।
মিথ্যে বলেছি।
কেন? মিথ্যে বললে কেন?
জানি না।
এই বলে সে চলে গেল।
বাসায় ফিরে কার্ডটা পড়ে বুঝতে পারলাম, ভালোবাসা দিবসের শুভেচ্ছাসহ বিকেল তিনটায় পল্লি নীড়–এ আমাকে দেখা করতে বলেছিল।
ওর অভিমান ভাঙাতে আরো সপ্তাহ খানেক কষ্ট করতে হয়েছিল।
এখন অবশ্য ও আমাকে বলে, সেদিন নাকি আমার জন্য ওর ভালোবাসা দিবসের আনন্দটা মাটি হয়ে গিয়েছিল।
উত্তরে বলি, মজা করতে গিয়েই এমনটা হলো। সঙ্গে আরো বলি, তাতে কি হয়েছে, পরেরটাতে তা পুষিয়ে দেবো।

অবশ্য মাঝে একটা বছর খুব কষ্টে কেটেছে।

যাক, সেগুলো আর মনে করতে চাই না। কষ্টের ফল সব সময়ই মিষ্টি। তোমাকে পেয়েছি তাতেই খুশি।

ঝিগাতলা, ঢাকা থেকে

নতুন অধ্যায়

– সোবহান

১৬ জুন ২০০৩। মতিঝিল অফিস পাড়ার এক রেস্টুরেন্টে আমরা বসেছিলাম। এক সঙ্গে তোলা ছবি, দুজনের দেয়া সব চিঠি এনেছিলাম। তার সামনে সব ছিড়লাম।

১৯৯৪–এ পথ চলা শুরু। তখন পড়তাম ক্লাস টেনে। সাড়ে আট বছর এক সঙ্গে পথ চলার পর বুঝতে পারলাম দুইজনের মানসিক ব্যবধান অনেক বেড়ে গেছে।

চিঠি ও ছবির ছেড়া অংশ তার হাতে দিলাম। রেস্টুরেন্ট থেকে বের হয়ে দুজনের দুই পথে যাত্রা শুরু। শেষ হলো একটা অধ্যায়ের।

অধ্যায় সমাপ্তির কারণ?

বেকারত্ব শেষ করে দুটো বিদেশি কম্পানিতে কন্ট্রাক্টে চাকরি করি। চাকরি জীবনের ওপর যাবতীয় বিতৃষ্ণা নিয়ে চাকরি আর করবো না এ মনোভাব পোষণ করি। সমাজ পরিবর্তন করে ফেলা সংক্রান্ত বই পড়ে ও গান শুনে দিন পার করছি। থাকা খাওয়া বাপের ঘাড়ে। বাবা নাখোশ, মা হতাশ। আশ্রয় খুজতাম তার কাছে। সে বেকে বসলো অবশেষে।

আমরা সমবয়সী ছিলাম। তার বাসায় চাপ ছিল বিয়ের ব্যাপারে। তার অসমর্থন, তার ভাই–ভাবীর চাপ, তার বন্ধুদের বিরক্তিকর সাজেশন আমাদের সম্পর্ককে জ্বালাময় করে তুলতো। মানসিক ব্যবধান আরো বাড়তে শুরু করলো।

সে যখন এক ব্যাংকে চাকরি নিল, আমার ছন্নছাড়া মনোভাব তার অসহ্য লাগতে শুরু করলো।

তার টিপটপ জীবন আমার মানতে কষ্ট হতো।

সে চাইতো প্রথাগত পথে চলি।

আমি চাইতাম আমার প্রথা বিরোধী মনোভাব ও সমর্থন দিক। ফলাফল, ছাড়াছাড়ি।

অতীত?

আমরা এক কলেজে পড়তাম। টিফিন ও ছুটির সময় লুকোচুরি প্রেম চলতো। কলেজের বাইরে একদমই দেখা হতো না। পরে ইউনিভার্সিটি জীবনে শান্তিতে প্রেম করতে পেরেছি। তার তিন ভাই। সবাই তার চেয়ে বয়সে অনেক বড়। এ তিন ভাই ও দুই ভাবীর তোপে আর আমার বেশ কড়া বাবা মায়ের শাসনে মধ্যে দিয়ে আমাদের প্রেম চলতো বেশ অ্যাডভেঞ্চার নিয়ে।

দুজনের কেউ মেটেরিয়ালিস্টিক ছিলাম না। অল্পতেই হতাম খুশি। পৃমিয়াম অথবা নিরাপদ বাসে বেশ ঘোরাঘুরি করতাম। ছোট এক সংসারের স্বপ্ন দেখতাম দুজন যেখানে অর্থের প্রাচুর্য না থাকলেও সুখের প্রাচুর্য থাকবে।

ছাড়াছাড়ির পর?

ছাড়াছাড়ির পর আমরা কেউ কোনো যোগাযোগ করার চেষ্টা করিনি। কমন বন্ধুদের বাসায় নিমন্ত্রণ থাকলে না দেখা হওয়ার চেষ্টা করতাম দুজনে। প্রথম প্রথম আমার বন্ধুরা ভাবতো বিশ পচিশ দিন পর ঠিক হয়ে যাবে সব কিছু। তখন বন্ধুদের ঝাড়তাম উচু মাত্রার ফিলসফি। যখন একে একে ছয় মাস পার হয়ে গেল তখন বোঝা গেল সব শেষ। যখন শুনতাম তার বিয়ের কথা হচ্ছে তখন ভেতরে ভেতরে ভেঙে পড়তাম। আট বছর

যাকে শুধু আমার করে পেয়েছি, সে অন্য কারো সঙ্গে বিয়ের পিড়িতে বসবে, হাত ধরে ঘুরবে এসব চিন্তা করে অস্থির হয়ে উঠতাম।

কিভাবে সময় পার হয়ে যায়, মানুষ বদলে যায়। আমার বন্ধুরা সবাই একে একে বিয়ে করে সংসার আরম্ভ করলো।

তাদের জীবন দেখে শান্তি পেলাম। বিয়ের পর বন্দী হয়ে থাকতে হয় এ বিশ্বাস দৃঢ় হলো। বাবা চাচ্ছিলেন এমবিএ পড়ি। হোয়াইট কলার একজিকিউটিভ হওয়ার ইচ্ছা ছিল না কোনোদিনই।

বাবার অনিচ্ছায় মাস্টার্স পড়া শুরু করলাম ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ-এ।

বর্তমান?

এভাবেই চলছিল। হঠাৎ তার একটা টেলিফোন কল বদলে দিল সব কিছু। দ্রুত সব বদলে যেতে আরম্ভ করলো। ৯ ফেব্রুয়ারি ২০০৫ আমাদের বিয়ে। পাঠকরা সে লেখা যখন পড়ছেন, পারিবারিবকভাবে আমরা এক ছাদের নিচে নতুন অধ্যায়ের শুরু করেছি। ও ফুড অ্যান্ড নিউট্রিশনে মাস্টার্স শেষ করে রেজাল্টের অপেক্ষায়, আমি মাস্টার্স শেষ করে একটা ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশনে চাকরি করছি। আমাদের জন্য দোয়া করবেন।

subhan009@yahoo.com

চিঠি

- তৌফিকা আক্তার

ইডেনে অনার্স ফার্স্ট ইয়ারে পড়ি, হলে থাকি। হঠাৎ বড় ভাইয়া হলে এলেন। ফুপুর বাসায় যেতে হবে। আব্বা আসবেন।

সামনে পরীক্ষা বলে কিছু বইপত্র নিয়ে গেলাম। ওখানে গিয়ে শুনি আব্বা এসেছেন আমাকে ময়মনসিংহ নিয়ে যেতে। ওখানে পাত্র আমাকে দেখবে।

যাবো না বলেও ফুপুর জোরাজুরিতে যেতে হলো।

পরদিন পাত্রী দেখা আর পরে এনগেজমেন্টের আনুষ্ঠানিকতা শেষে চলে এলাম হলে।

ফাহিমের দিকে একটিবারের জন্যও তাকাইনি। মাথা এতো নিচু করেছিলাম যে, ওর বোন বলছিল, মাথা তোলো, তোমার ঘাড় বাকা হয়ে যাবে।

বিয়ের ডেট হবে আমার পরীক্ষা আর ওর ছুটির তারিখ দেখে। পরীক্ষার ডেটও দিচ্ছিল না, ওর ছুটিও হচ্ছিল না।

হলের মেয়েরা বললো, আর্মিরা এমন নিরামিষই হয়, এখন তো বিয়ে ঠিক হয়েছেই, একটা চিঠিও তো দিতে পারে।

এমনি অবস্থায় হলে হঠাৎ ওর চিঠি পেলাম। চিঠি পাওয়ার পর উত্তর দেবো কি দেবো না যখন অবস্থা তখন পেলাম আম্মার চিঠি। ছেলে চিঠি দিলে উত্তর দিও না, সে এখনো তোমার অধিকার পায়নি।

থেমে গেলাম।

তখন এলো আপার চিঠি। লিখেছে, ছেলেকে চিঠি দিয়ে থাকলে আম্মাকে জানিও না।

ইতিমধ্যে ফাহিমের দ্বিতীয় চিঠি এলো।

আপনি, তুমি উহ্য রেখে চিঠি লিখলাম।

বান্ধবীরা খুব উৎসাহ দিল।

আমাদের ভালোবাসার গল্পও শুরু হলো। আমি ছবি পাঠালাম, সেও পাঠালো। ছবিতেই ওকে প্রথম দেখলাম। বিয়ে হতে তিন মাস দেরি হলো।

আমাদের চিঠি লেন–দেন কথা দুই পক্ষের কেউ জানতো না। পরে আমি আমার আপাকে আর ফাহিম ওর আপাকে বললো। সেই তিন মাসে চিঠির মাধ্যমে আমরা অনেক সহজ হয়ে গিয়েছিলাম সে জন্য বিয়ের পর ওকে একটুও অচেনা মনে হয়নি।

ও যখন সিয়েরা লিওনে ছিল তখনো ওর চিঠি আমার বিরহী মনকে সাহস দিয়েছে।

আজ পর্যন্ত আমাদের সাময়িক বিচ্ছেদ দীর্ঘতর হলে পুরনো চিঠিগুলো পড়ি। সেই তিন মাসের সুখ অনুভূতি ওর প্রতি আমার ভালোবাসাকে বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়।

চৌরঙ্গীর মোড়, আকুয়া, ময়মনসিংহ থেকে

এক টুকরো মেঘ

- রোজী রহমান

ঘড়ির কাটা বারোটা ছুই ছুই করেছে। তবে বারোটা বেজে যাচ্ছে চলন্ত যাত্রীদের। আমার অবস্থাও তথৈবচ। ঘামে ভিজে শরীরের সঙ্গে লেপ্টে গেছে শাড়ি। ভীষণ অস্বস্তি হচ্ছে। কিন্তু কিছুই করার নেই।

মামা এয়ারকন্ডিশনড বাসের টিকেট কেটে দিতে চেয়েছিলেন।

খুব আপত্তি করে বলেছি, দরকার নেই।

ব্যাগ থেকে হাতপাখাটা বের করলাম। কিন্তু সেটাও যেন আমার সঙ্গে বিদ্রো করতে চাইছে। গরম হাওয়া। বিরক্ত হয়ে নামিয়ে রাখলাম।

একটা গল্পের বই ছিল সঙ্গে। রবীন্দ্রনাথের *চোখের বালি*। পড়তে চেষ্টা করে দেখি কিছুতেই মনোযোগ দিতে পারছি না। এই গরমে সাহিত্য রস গেলার চেষ্টা করলে সেটাও যে বদহজম হবে, বুঝতে বাকি থাকলো না।

বাসের অন্য যাত্রীদের দিকে নজর দিলাম। আমার পেছনে বসেছে দুই বান্ধবী, মনে হয় কলেজে পড়ে। তাদের কথা আর দুরন্ত উচ্ছ্বাসে সচকিত হয়েছে সবাই। তারা গ্রাহ্যই করছে না।

হাসলাম একটু। কলেজ জীবনের সময়টাই এ রকম। দুই তিনজন বান্ধবী এক সঙ্গে হলে কথা থামতেই চায় না। হেন বিষয় নেই যা নিয়ে কথা হয় না!

পা উঠিয়ে আরাম করে বসলাম। ইন্টারমিডিয়েট ফাইনাল শেষ হলো এক সপ্তাহ আগে। আর অপেক্ষা করতে পারছিলাম না। এসএসসি–র আগ পর্যন্ত প্রতি বছর কোনো না কোনো সময় দাদুবাড়ি যেতাম। কিন্তু এরপর আর যাওয়া হয়ে ওঠেনি। বহু দিন পর আবার চলেছি সে প্রিয় গন্তব্যের উদ্দেশ্যে। মামা, ভাই, মা, কেউ আসতে পারেনি। তাই এই প্রথম একা যাচ্ছি কোথাও। প্রায় তিন চার ঘণ্টার জার্নি। নোয়াখালীতে খুব ক্লান্তিকর ভ্রমণ।

বাস থামলো এমন সময় কুমিল্লা রেস্টুরেন্টে। হাত মুখ ধুয়ে খেয়ে নিলাম।

কিছুক্ষণ পর বাসে উঠে দেখি আমার জানালার পাশের সিটটা দখল করে নিয়েছে একটা ছেলে। শান্তভাবে বললাম, এটা আমার জায়গা, আপনি পাশের সিটে সরে বসুন।

ছেলেটা নড়েচড়ে স্থায়ীভাবে বসলে, মুখ দিয়ে একটা কথাও বললো না।

মেজাজ চড়ে গেল, এতোটা অভদ্র হয় নাকি মানুষ! আবার বললাম। বেশ কড়া ভাষায়, দেখুন, এটা আমার জায়গা।

ছেলেটা আমা র দিকে একবার তাকিয়ে নির্বিকারভাবে হাতে ধরা বইয়ে চোখ রাখলো।

আচ্ছা বদ লোক তো!

আমার পিছনে অন্যান্য যাত্রীরা দাড়িয়ে সবাই আমার জন্য নিজের জায়গায় যেতে পারছে না।

অগত্যা বসতেই হলো। পাশে সিটে সেই অভদ্র যুবক। আমিও বই বের করলাম, পড়তে শুরু করলাম। অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে। আড়চোখে তাকিয়ে দেখি ছেলেটা বেশ অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। কটমটে একটা দৃষ্টি বুলিয়ে আবার বইয়ে মন দিলাম।

এক্সকিউজ মি, আপনি কি রোজী?

এবার আমার অবাক হবার পালা। মুখে চাপ দাড়ি, চোখে মোটা কাচের চশমা, ছেলেটাকে আগে কোথাও দেখেছি বলে মনে পড়ছে না। কিন্তু চশমার ভেতরের গভীর কালো চোখ দুটো কেমন পরিচিত মনে হলো। হ্যা, সেই দৃষ্টি, সেই চোখ, *প্রভাত*।

যাক, চিনতে পেরেছিস। হাসি মুখে বললো।

চমকে উঠলাম। প্রায় পাচ বছর আগে প্রভাতের সঙ্গে আমার শেষ দেখা। কলেজে ওর মতো উচ্ছল আর প্রাণবন্ত ছেলে খুব কমই ছিল। আমরা পাচজন প্রভাত, ঋতু, মিনু, সুহিত, আমি। ক্লাস ফোর থেকে এক সঙ্গে পড়তাম। খুব ভালো বন্ধু ছিলাম আমরা। কলেজ জীবন উপভোগ করেছি প্রাণ ভরে। কলেজে যেগুলো করা বারণ ছিল সেগুলোই করেছি সবার আগে। কলেজের খোলা ছাদে দৌড়েছি, বৃষ্টিতে ভিজেছি, দেয়াল টপকে পার হয়েছি কলেজের সীমানা। একবার সবাই মিলে মাঠে সিগারেটও টেনেছি।

প্রভাতকে আমার ভালো লাগতো। ওর যে জিনিসটা আমার সবচেয়ে ভালো লাগতো সেটা হলো ওর হাসি। ও আমার সবচেয়ে ভালো বন্ধু ছিল। প্রভাতের বাবা মা গ্রামে থাকতেন। ও পড়াশোনা করতো কলেজের হস্টেলে।

একদিন মাঠে বসে সবাই গল্প করছি। হঠাৎ একটা লোক প্রভাতকে ডাক দিল।

কিছুক্ষণ পর এসে বললো, কালই বাড়ি যাচ্ছি। চাচা এসেছেন খবর নিয়ে বাবা অসুস্থ। দোয়া করিস সবাই।

তারপর থেকে প্রভাতের সঙ্গে আর দেখা হয়নি। আজ আবার দেখা হলো প্রভাতের সঙ্গে। মনে হলো এক টুকরো মেঘ আমার মনের আকাশে সরে গিয়ে অনেক দিন পর ঝলমল রোদ উঠলো।

মিরপুর, ঢাকা থেকে

প্রতিভা

– মোহাম্মদ ওয়ালিউর রহমান খোরশেদ

মানব জীবনের সফলতার চাবিকাঠি প্রতিভার মাঝে বিরাজমান। যাদের মাঝে প্রতিভা থাকে তাদেরকে প্রতিভাবান বলে। আমার মাঝে কোনো প্রতিভা ছিল কি না জানতাম না।

সেদিন ছিল ঈদুল আজহার রাত। আমাদের পাশের বাড়িতে এক দূর সম্পর্কের চাচাতো বোন ছিল। নাম ঝুমু।

মেয়েমানুষ দেখলে সব সময় আনইজি ফিল করতাম। সন্ধ্যায় একজনের কাছে খবর শুনলাম যে, ঝুমুদি আমাকে যেতে বলেছে।

আমি তো ভয়ে অস্থির। কারণ ওর মতো মেয়ের কথা শোনার চেয়ে পৌষের নদীতে গলা ডুবিয়ে সাত ঘন্টা দাড়িয়ে থাকা অনেক ভালো। এতোই চাপাবাজ মেয়ে ঝুমুদি।

যাহোক, দোয়া পড়তে পড়তে তাদের বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হলাম।

স্বচ্ছ জ্যোৎস্নায় নারকেল গাছের গোড়ায় বসে বসে গুন গুন করে গাইছে ঝুমুদি। *আমারও পরাণও যাহা চায়, তুমি তাই গো...*।

গলা খাকারি দিয়ে পেছন থেকে বললাম, ঝুমুদি, আমাকে ডেকেছো?

হ্যা। তোকে এখন ডাকিনি। বিকেলে ডেকেছিলাম। তারপর ঝুমুদি আমার দিকে তাকিয়ে বললো, এই, দেখ তো! শাড়ি পরলে আমাকে কেমন দেখায়।

আমি তো অবাক! এমন এক পলিথিন মার্কা শাড়ি পরেছে যে, নিচের শাদা ব্লাউজ, তার ভেতরে কালো ব্রাটা দেখেতে কোনো অসুবিধা হলো না। ঝুমুদির দিকে তাকিয়ে আর চোখ নামাতে পারলাম না।

সে আমাকে বললো, এই শোন, এমনভাবে আমার দিকে তাকিয়ে জ্বালা বাড়াসনে।

আবারও ঝুমুদির দিকে তাকালাম।

এতোদিন পরে আমার বিশ বছরের জীবনে অজানা শিহরণ জাগলো। সাহস করে ছুয়ে ফেললাম তার বুক।

ঝুমুদি বললো, এই, এখানে ধরলে বুঝি তোর ভালো লাগে।

বললাম, হ্যা।

তারপর পলিথিন শাড়ি হয়ে গেল চাদর। সেই চাদরের ওপর বসে আস্তে আস্তে তার ব্লাউজের হুক খুলে ফেললাম। ঠোট জোড়া পুরে দিলাম তার ঠোটে। কি অপূর্ব সুধা, কি জাদু, কি আরাম, কি সুগন্ধ! পদ্মা মেঘনার জলে যেমন সারি সারি নৌকা চলে তেমনি আমার নৌকাও চালালাম।

ঝুমুদির নদীর গভীর জলে যন্ত্রপাতির সঠিক ব্যবহার করলাম। কতোক্ষণ ব্যবহার করেছিলাম সেদিন জানি না।

পরদিন সকালে তার সামনে পড়তেই বললো, কি রে, তোর মতো এমন গবেট মার্কা লোকের মাঝে এতো প্রতিভা?

লজ্জায় কোনো কথা বলতে পারিনি সেদিন।

নেত্রকোনা থেকে

শাশুড়ি

– পরী

আজ থেকে মাত্র এক মাস আগে গত ২৯ নভেম্বর আমার শাশুড়ি পৃথিবীর বুক থেকে দেহ ত্যাগ করে চলে গেছেন পরপারে। তার প্রতি অসম্ভব শ্রদ্ধা বোধ তো অবশ্যই আছে সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না।

গত আঠারো বছর ধরে ওনার সঙ্গে আমার প্রতিদিন নিয়মিত রুটিন মাফিক চলা হতো। আঠারো বছর বয়সে বিয়ে হয়ে এসে ওনার সঙ্গেই আমার সংসার জীবনের শুরু।

আমার শ্বশুরও ছিলেন। তিনিও চলে গেছেন বেশ কয়েক বছর আগে।

আমার শাশুড়িরকে এতো বৃদ্ধ বয়স্ক অবস্থায় পেয়েছি যে, তাকে সব কিছুর উর্ধে মনে হতো। পূজনীয় একজন মনে হতো। কারণ এতো বয়সী কারো সঙ্গে আগে থাকা হয়নি কোনোদিনও।

তিনি ছিলেন একজন বিদূষী মহিলা। ওনার ছেলেমেয়েদের কাছে ওনার সারা জীবনের গল্প শুনে এবং পরে এতোটা বছর ওনার সঙ্গে থেকে ওনার সমস্ত কর্মকাণ্ড থেকে জীবনকে নতুনভাবে উপলব্ধি করতে শিখেছি।

তিনি প্রচণ্ড ধার্মিক ছিলেন। পাচ ওয়াক্ত নামাজ, অবসর সময়ে কোরআন পাঠ ও হাদিসের বই পড়া এবং সবাইকে উপদেশ দেয়া, বই পড়ে শোনানো, এসব ছিল ওনার প্রতিদিনের কাজ।

খুব পর্দানশীল ছিলেন। এক ঘরে থাকতেন এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন জীবন যাপন করতেন। ছেলেমেয়েদের ও নাতি নাতিনদের সঙ্গে ছাড়া অন্য কারো সঙ্গেই তিনি দেখা দিতেন না। শুনেছি, আগেও তিনি কারো সঙ্গে দেখা দিতেন না।

খুবই ধৈর্যশীল ছিলেন। সংসার ধর্ম করতে যতো রকমের ধৈর্য ও গুণের দরকার সর্বগুণই ওনার ছিল। এতো বড় সংসার চালিয়ে আটজন সন্তান মানুষ করেছেন, সব কিছুই পর্দার মধ্যে থেকে।

সবাই ওনাকে প্রচুর সম্মান করেন ওনার বড় বড় মহৎ গুণের জন্য। সব সময় সবার খোজখবর নিতেন, ভালোভাবে আপ্যায়ন করতেন আর সবাইকে প্রচণ্ড ভালোবাসতেন। হিংসা, লোভ, স্বার্থপরতা এসব কোনোদিনই দেখিনি।

গত দুই বছরে শারীরিক অসুস্থতা বেশি বাড়ে। প্রচুর কষ্ট পান। ওষুধের ওপর বেচে ছিলেন। তারপরও নামাজ কোনোদিন ছাড়তেন না। সময় মতো ঘড়ি দেখেই নামাজ পড়তেন। সবাই নামাজ পড়ে কি না খোজখবর করতেন। আসলে ওনাকে এতো কাছে থেকে দেখে অনেক কিছু শিখেছি যে, সব অনেক বড় ব্যাপার! এসব কাউকে বলেও বোঝানো যাবে না আর নিজেও শেখা যায় না।

প্রতিটি সংসারে ঘরের প্রধানের কাছ থেকে বিশেষ করে দাদা-দাদি, নানা-নানিদের কাছ থেকে অনেক কিছু শেখার আছে। যে ঘরে একজন বয়স্ক মুরুব্বি থাকেন সে ঘরে ছেলে, বৌ, বাচ্চাদের অনেক কিছু শেখার থাকে। তারা সবাই শেয়ার করতে শেখে, কম্প্রমাইজ করতে শেখে, বিবেক খরচ করতে শেখে, ধৈর্য ধারণ করতে শেখে।

আমার দুই বাচ্চা। এই বয়সে যতোটুকু পারিবারিক পরিবেশ থেকে শিখেছে তা পয়সা খরচ করেও পারবো না। বাবা মাকে দেখেছে ওদের দাদির জন্য কি করেছি। ওরা যা শিখলো, ভবিষ্যতে তা কাজে লাগাতে পারবে।

আমার শাশুড়ির প্রতি আমি প্রচণ্ড গর্ববোধ করি। তিনি দুনিয়ায় সুসন্তান রেখে গেছেন যারা ওনার জন্য অনেক ইবাদত করছেন। তিনি এতো ভালো সেবাযত্ন পেয়েছেন, এতো শ্রদ্ধা, এতো ভালোবাসা, আন্তরিকতা নিয়ে পৃথিবী থেকে গেছেন তার একমাত্র কারণ তিনি ছিলেন একজন ভালো মানুষ।

আমি ওনার সবচেয়ে কনিষ্ঠ সন্তানের স্ত্রী। আমি গর্ববোধ করি, তিনি কতোবড় ভাগ্যবতী! এই যে এ সন্তানের সমস্ত সেবা, যত্ন নিয়ে তার কাধে করে কবর পর্যন্ত গিয়েছেন। ওনার সন্তান ভাগ্যবান যে, মাকে সারা জীবন বিন্দুমাত্র অবেহলা, অবজ্ঞা না করে বিবেক খরচ করে আন্তরিকতার সঙ্গে যত্ন করে সেবা করেছে শেষ দিন পর্যন্ত এবং নিজ হাতে কবরে শুইয়ে রেখে এসেছে। হতে পারে এসব অনেকে করে থাকে! তবে আমার চোখে দেখা এ এক অন্য রকম অনুভূতি।

সার্থক আমার শাশুড়ির জীবন। এ রকম গর্বময় জীবন সব মায়ের হোক। সার্থক আমার স্বামীর জীবন যে, মা-বাবার সেবা করে তাদের অন্তর থেকে এতো দোয়া আদায় করে নিয়েছেন। ঘরে ঘরে এমন সুসন্তান জন্ম হোক এই কামনা করি।

আমাদের সবার মাঝ থেকে হঠাৎ করে সকালবেলা এই মানুষটি চলে গেলেন। তিনি অসুস্থ ছিলেন, কষ্ট পাচ্ছিলেন। সবাই বলতো, এতো কষ্ট না পেয়ে আল্লাহ নিয়ে গেলেই ভালো হতো।

আসলে পৃথিবীতে জন্মালে তিল তিল করে দিনে দিনে একদিন মৃত্যুর দিকে যেতে হবে এটাও একটা অন্য রকম চিরসত্যি। ওনার খুব কাছে থেকে আমি অনুভব করেছি। ওনার এভাবে চলে যাওয়াতে আমার ঘরটা আস্তে আস্তে ফাকা হলো। সবাই চলে গেল। ওনার সব ছেলে-মেয়ে নাতি-নাতনিরা।

আমার ঘরের মাঝে আমার স্বামী, বাচ্চাদের কাছেও যে শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে তা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছি। যখন সবাই যার যার কাজে চলে যায়, আমি একা থাকি আর ওনার সব কথা স্মৃতি মনে হয়। এবং সব রেখে যাওয়া স্মৃতিগুলো দেখি তখন মনটা খুব খারাপ হয়ে যায়।

ওনার ঘরটা এখন খালি। আমি গিয়ে মাঝে মধ্যে বসি। ওনার সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘন্টা সব গল্পের কথা মনে হয়। ওনাকে খুব স্বরণ করি। ওনার সব কথা যা লিখলাম, আসলে এসব কাউকে বেশি করে বলতে গেলে হয়তো সে ভাবতে পারে আমি অভিনয় করছি বা লোক দেখানো। তাই লিখে পাঠালাম আমার শাশুড়ির জন্য আমার মনে অনেক লুকিয়ে থাকা গর্বের কথা, ভালোবাসার কথা। মনে শান্তি পাই এটা ভেবে, তিনি আমাদের

প্রাণভরে দোয়া করে গেছেন। আল্লাহর কাছে বিশেষভাবে দোয়া চাইবো, আল্লাহ যেন ওনাকে জান্নাতবাসী করে। পরকালে শান্তিতে রাখে। বিগত নব্বই বছর বয়সের বেচে থাকা জীবনের মধ্যে কোনো ভুলভ্রান্তি থাকলে তা যেন আল্লাহ ক্ষমা করে দেয়।

মৃত্যুর পর ওনাকে শেষ গোসল করালাম, কাফন পরানোর মধ্য দিয়ে আরেকবার উপলব্ধি করলাম এ পৃথিবী কতো নিষ্ঠুর! এখান থেকে কেউ কিছু নিয়ে যেতে পারে না সামান্য হাড়, চামড়া আর শাদা কাপড় ছাড়া। আরেকবার এ চরম সত্যিটা অনুভব করলাম, তাহলে শুধু শুধু এ পৃথিবীতে এতো স্বার্থপরতা আর হিংসা–বিদ্বেষ। এই চরম সত্যের হাত থেকে কেউ বাচতে পারবে না। মৃত্যু হাতছানি দিয়ে ডাকবেই।

আমি মনে করি সবার মাঝে ভুল বোঝাবুঝির অবসান করে স্বার্থপর না হয়ে মিলেমিশে সুন্দর একটা সংসার রচনা করে সুন্দরতম পৃথিবীর বুকে চিরসুন্দর হয়ে বেচে থেকে বিদায় নেয়া একমাত্র কামনা হওয়া উচিত।

পরিবাগ, ঢাকা থেকে

ভ্যালেন্টাইনস ডে- র স্ট্যাম্প

- এ টি এম আনোয়ারুল কাদির

ভালোবাসা বলতে আমরা সাধারণত নারী–পুরুষের প্রেমকেই বুঝে থাকি। কিন্তু না, ভালোবাসার ক্যানভাসটা অনেক বড়। ভালোবাসার কোনো নির্দিষ্ট সংজ্ঞা দেয়া যেমন দুরূহ তেমনি একে বেধে রাখাও দুঃসাধ্য। ভালোবাসা মুক্ত, ভালোবাসা সুন্দর, ভালোবাসা স্বাধীন, ভালোবাসা অমর। সব দেশেই ভালোবাসা চলে তার নিজস্ব গতিতে। ইতিহাস বলে, কোনো বাধাই ভালোবাসাকে ঠেকাতে পারে না। যেমন লাইলী–মজনু, রোমিও–জুলিয়েটের প্রেম সফল না হলেও তারা মৃত্যু দিয়ে ভালোবাসাকে জয় করে নিয়েছিলেন এবং ইতিহাসে অমর হয়ে রয়েছেন। এছাড়া ভালোবাসার স্মারক হয়ে রয়েছে তাজমহল, মথুরা, বৃন্দাবন ইত্যাদি। তবে সবচেয়ে বেশি আলোচিত হয়ে আছেন সেন্ট ভ্যালেনটাইন।

প্রতি বছর ১৪ ফেব্রুয়ারি সেন্ট ভ্যালেনটাইনের নামে ভ্যালেনটাইনস ডে বা ভালোবাসা দিবস উদযাপন করা হয়। অনেকে ১৪ ফেব্রুয়ারিকে ভালোবাসা দিবস উল্লেখ করে থাকে এবং তাদের ধারণা এই দিবসটি বিশ্বব্যাপী উদযাপিত হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস, বিশ্ব খাদ্য দিবস, বিশ্ব ডাক দিবস–এর মতো জাতিসংঘ ভালোবাসা দিবস–এর কোনো ঘোষণা দেয়নি। এখন প্রশ্ন আসতে পারে, বাংলাদেশে ভ্যালেনটাইনস ডে বা ভালোবাসা দিবস উদযাপনের কারণ কি এবং এর ভিত্তি কি?

বাংলাদেশে ১৯৯৩ সাল থেকে ভালোবাসা দিবস উদযাপিত হচ্ছে। বৃটেন ও আমেরিকায় এই দিবস পালনের মূল উদ্দেশ্য হলো বাণিজ্যিক। কৃসমাস ও নিউ ইয়ার্স গৃটিংস কার্ড প্রকাশকরা নব্বই দশকের শুরুতে ভ্যালেনটাইনস ডে–র প্রচার এবং প্রচলন শুরু করে। এর সঙ্গে পারফিউম ও চকলেট প্রস্তুতকারক কম্পানিগুলো যোগ দেয়। বর্তমানে ভ্যালেনটাইনস ডে সারা ইওরোপ ও এশিয়াতে ব্যাপকভাবে উদযাপিত হয়। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ভ্যালেনটাইনস ডে মূলত প্রেমিক–প্রেমিকাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। আতিথেয়তা, আন্তরিকতা ও ভালোবাসার দেশ হিসেবে পরিচিত বাংলাদেশে প্রেমিক–প্রেমিকাদের পাশাপাশি স্বামী–স্ত্রী, পিতা–মাতা–সন্তান, ভাই–বোন, বন্ধু–বান্ধবী, ছাত্র–শিক্ষক সব ধরনের সম্পর্কের মধ্যে ভালোবাসা দিবস উদযাপিত হয়। বাংলাদেশে ভালোবাসা দিবস উপলক্ষে বিভিন্ন পত্র পত্রিকা বিশেষ সংখ্যা প্রকাশসহ ভিউ কার্ড, গানের ক্যাসেট প্রকাশ করে এবং টিভিতে বিশেষ নাটক প্রচার করে।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ভালোবাস বিষয়ক সুন্দর সুন্দর ডাকটিকেট, বিশেষ খাম, বিশেষ সিলমোহর, পোস্ট কার্ড, মিটার ফ্রাংকিং প্রকাশ করেছে। ভালোবাসার ওপর ডাকটিকেট প্রকাশে আমেরিকা সবচেয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। ১৯৭৩ সাল থেকে আমেরিকা Love শিরোনামে প্রায় প্রতি বছরই আকর্ষণীয় ডাকটিকেট

প্রকাশ করেছে এবং এই ডাকটিকেটগুলো প্রেমিক-প্রেমিকারা ভ্যালেনটাইনস ডে-তে গৃটিংস কার্ডের সঙ্গে পাঠিয়ে ভালোবাসা বিনিময় করে। ১৯৯৮ সালে আমেরিকা ১৯৭৩ থেকে ১৯৯৮ সালের মধ্যে প্রকাশিত Love সিরিজের আঠারোটি ডাকটিকেটের ছবি দিয়ে পোস্ট কার্ড প্রকাশ করে। এছাড়া আয়ারল্যান্ড ১৯৯৮ সালে Love is ... শিরোনামে চারটি এবং ফ্রান্স ভালোবাসা বিষয়ক ডাকটিকেট ও সুভেনির শিট প্রকাশ করেছে।

ভ্যালেনটাইনস ডে উপলক্ষে পোল্যান্ড ১৯৯৩ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি দুইটি, আইভরি কোস্ট ২০০২ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি আটটি ডাকটিকেট প্রকাশ করেছে বলে জানা গিয়েছে। ইকুয়েডর ১৯৯৬ সালে মিটার ফ্রাংকিং এবং বৃটেন ২০০৪ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি ভ্যালেনটাইনস ডে উপলক্ষে বিশেষ সিলমোহর প্রকাশ করে। অথচ ভালোবাসার দেশ বাংলাদেশ থেকে আজ পর্যন্ত কোনো স্মারক ডাকটিকেট, বিশেষ খাম, বিশেষ সিলমোহর, পোস্ট কার্ড, মিটার ফ্রাংকিং প্রকাশিত হয়নি। ভালোবাসা বিষয়ক ডাকটিকেটের চাহিদা বিশ্বব্যাপী। ভালোবাসা বিষয়ক ডাকটিকেট প্রকাশিত হলে ডাকটিকেট সংগ্রাহকরা এর মাধ্যমে ভ্যালেনটাইন শুভেচ্ছা পাঠাতে পারবে।

এ দেশের ডাকটিকেট সংগ্রাহকরা অনেকবার ভালোবাসা বিষয়ক ডাকটিকেট প্রকাশের আবেদন জানিয়েও বাংলাদেশ ডাক বিভাগের কাছ থেকে কোনো সাড়া পায়নি। শেষ পর্যন্ত ২০০২ সালে বাংলাদেশের ডাকটিকেট সংগ্রাহকদের পক্ষ থেকে ভালোবাসা দিবস উপলক্ষে একটি বিশেষ খাম প্রকাশ করা হয় যা অত্যন্ত আকর্ষণীয়। এই বিশেষ খামে একজন বৃদ্ধ ও বৃদ্ধার ছবি স্থান পেয়েছে যা থেকে এটা স্পষ্ট বোঝা যায় যে, উভয়ে তাদের হারিয়ে যাওয়া ভালোবসার দিনগুলোর স্মৃতি রোমন্থন করছেন। এই বিশেষ খামটি সংগ্রহে রাখার মতো।

ডাক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ডাক বিভাগ-এর কাছে এই লেখার মাধ্যমে ভালোবাসা দিবস বা ভালোবাসা বিষয়ক ডাকটিকেট, বিশেষ খাম, বিশেষ সিলমোহর, পোস্ট কার্ড প্রকাশের জন্য অনেকেই জোরালো আবেদন জানাচ্ছেন।

I DON'T KNOW

– গ্রীষ্ম

আমার জীবনে কোনোদিন প্রেম আসবে চিন্তাও করিনি। কারণ মেয়ে ভোলানো কথা আমি বলতে পারি না। তাই কোনো মেয়েকে প্রপোজ করার সাহস আমার ছিল না।

বন্ধুরা অনেকেই প্রেম করতো। তাই প্রেম করার ইচ্ছা জাগতো। বন্ধুদেরকে বলতাম একটি প্রেম করিয়ে দিতে। আমার খুব কাছের বন্ধু Honey-কে বাধ্য করলাম তার প্রেমিকার বাবার ফোন নাম্বার দিতে। কারণ তার প্রেমিকার বড় বোন ছিল। তাকে আমি খুব পছন্দ করতাম।

অনেক সংকোচের পর তাকে ফোন করলাম। ফোন করার পর আমার যা ভয় তা-ই হলো।

সে আমাকে বললো, আমি রোমান্টিক না। আমি নাকি জঙ্গল থেকে এসেছি।

তবু আমি হাল ছাড়িনি।

অবশেষে একটি ফাস্ট ফুডের দোকানে আমাদের দেখা হয়।

দেখা করতে গিয়ে আমার হাত-পা কাপতে থাকে। এক পর্যায়ে আমার হাত থেকে কোকের বোতল পড়ে যায়। তারপর আমাদের প্রেম হয়।

আনন্দের মাঝে মান-অভিমান চলতে থাকে। অভিমান করে সে একদিন একশ আটটি ঘুমের ওষুধ খেয়ে ফেলে।

খেলে ফেলার পর আমাকে SMS করেছিল। তুমি আমাকে বাচাও।
কিন্তু তার মায়ের ভয়ে বাসায় যেতে পারিনি।
সেদিন না যেতে পেরে আজও লজ্জা পাই।
তারপর আমরা ফ্রি হতে থাকি। আমাদের মাঝে আদর-সোহাগের লোভ চলে আসে। সুযোগ খুজতে থাকি কখন ওর মা বাসা থেকে বের হন।
ওর মা বের হলেই চলে যেতাম ওর বাসায়। এভাবে অনেক দিন বাসায় যাই।
একদিন ধরা পড়ি ওর মায়ের কাছে।
আমি বাথরুমে লুকাই।
ওর মা ওকে দেখে বুঝে গিয়েছিলেন বাসায় কেউ ঢুকেছে।
কারণ তার চুল ছিল ভেজা, ঠোট দুটি ছিল টকটকে লাল, ওকে লাগছিল মাতালের মতো।
তারপর বাথরুম থেকে মা আমাকে বের করেন। আমাকে বলেছিলেন, তুমি কেন এসেছো?
আমি ভয়ে কিছু বলতে পারছিলাম না। শুধু বলেছিলাম, I don't know।
আজও আমাকে I don't know বলে সে হাসে।
সে এখন অনেক চাপের মধ্যে আছে। আমার জন্য অনেক কষ্ট সহ্য করছে। আমি তাকে খুব ভালোবাসি। তার ভালোবাসার কাছে আমার ভালোবাসা অতি সামান্য। এই ভালোবাসা দিবসে আমার জীবনটা ওকে উপহার দিলাম।

ভূতের গলি, ধানমন্ডি থেকে

ফাদ

– আহমদ হাসান খান

চাকরির সুবাদে ১৯৭৫ সালে আমাকে সিলেট জেলার সীমান্তবর্তী একটি মহকুমা শহরে যেতে হয়েছিল। জুন, জুলাই এবং আগস্ট এই তিন মাস সেখানে অবস্থান করতে হয়েছিল। এই অবস্থানকালে আমার জীবনে একটি কাহিনীর জন্ম হয়। আজ পর্যন্ত কাহিনীটিকে ধারণ করে আছি।
আমার এই কাহিনীটিকে অনেকে অবিশ্বাস্য বিবেচনা করবেন এবং অনেকে সমালোচনা মুখর হবেন। তবু বলছি, মানুষের জীবনে কতো কিছুই তো ঘটে যায়। স্থানীয় কর্মকর্তা আমার অবস্থানের জন্য এক মালিকের চার রুম বিশিষ্ট ঘরের একটি রুম ভাড়া নেয়ার প্রস্তাব দেয়াতে মালিকের একমাত্র গার্ডিয়ান এবং দারোগাকন্যা ঝাড়ি দেয়ার পর বিতাড়িত করলো।
পরের দুই দিন অনেক অনুনয়-বিনয় করায় চার নাম্বার রুমটিকে বরাদ্দ করেন। সন্ধ্যার পর সংশ্লিষ্টরা সমবেতভাবে আমাকে রুমে অধিষ্ঠিত করে গেল। একটি তক্তপোষ, হাড়ি-পাতিল এবং চুলা ক্রয় করে দেয়া হয়েছে। আমাকে ঘাড়ে ধরে অকুস্থলে হাজির করায় মনটা বেশ খারাপ ছিল। আমাকে বাবুর্চিও দেয়া হয়েছে। তাকে ভালো ভাত রান্না করতে বলায় সেভাবেই রান্না করছিল।
মালিকের দারোগাকন্যার আগমন হলো। রান্নার আয়োজন প্রত্যক্ষ করার পর আমাকে বেশ জেরা করা হলো। তিনি পিতা-মাতার একমাত্র কন্যা। তার ছোট একজন মাত্র সহোদর আছে। চার রুম বিশিষ্ট ঘরের পূর্ব পাশে লাগোয়া হলো দারোগা সাহেবার ঘর। অন্য পাশে তার পিতা-মাতার ঘর। ছোট ভাই বাইরের অঙ্গনে কাছারি ঘরে অধিষ্ঠান করে।
দারোগা সাহেবা লন্ডন প্রবাসী জনৈক সুলতান মিয়া চৌধুরীর (নকল নাম) দ্বিতীয় স্ত্রী। তার গর্ভজাত চার ও সাত বছরের দুটি কন্যা আছে।

ধরা যাক, তার নাম কোহিনূর বেগম। সাত দিন না যেতেই তিনি আমাকে চিরকুট পাঠানো শুরু করলেন। সেগুলোর সারমর্ম হলো যে, *সেই টাংগাইল থেকে তুমি এখানে কেন এসেছো? তোমাকে দেখার পর থেকেই আমার মরণ হচ্ছে। আমাকে তুমি জাদু কেন করেছো? আমার এখন উপায় কি হবে?*

মহিলাটি বেশ স্বাধীনচেতা এবং মুক্তমনের দারোগা। তার মাতার কোনো সাড়া-শব্দ শোনা যায় না। তার পিতা একজন নিরীহ এবং সজ্জন ব্যক্তি। ছোট ভাইটি জ্যেষ্ঠা ভগ্নিকে খুবই ভয় করে। ওদের সংসার চলে কোহিনূর বেগমের দৌলতে। তার লন্ডন প্রবাসী স্বামী প্রতি মাসে তাকে চল্লিশ হাজার করে টাকা পাঠায়।

তৃতীয় সপ্তাহ থেকে আমার বিপদ শুরু হলো। আমি যতোক্ষণ রুমে থাকি, মহিলাটি যখন-তখন এসে হাজির হয়। আমার মন খারাপ কি না, স্ত্রী-সন্তানদের জন্য কষ্ট হচ্ছে কি না। এসব জিজ্ঞাসাবাদ করে।

সেদিন রাতের আহার পর্ব সমাধা করে শুয়ে পড়েছি। আমার ঘুম ভাঙানো হলো। হুকুম হলো দরজা খোলার। দরজা খুলতেই ভেতরে এসে সে দরজায় ছিটকিনি আটকে দেয়ার পর আমাকেও আটক করলো।

আমার নিঃশ্বাস ফুরিয়ে গেল।

আমাকে জড়িয়ে ধরে কান্না শুরু করলো। বললো, কেন তুমি এখানে এসেছো? সুলতান মিয়ার আমি দুই নাম্বার বিবি। প্রথম বিবিকে নিয়ে সে লন্ডন থাকে। আমাকে মাস মাস টাকা দিয়েই খালাস। আমার যে আমি আছি, সেই বিচার ওই লোকের নেই। তাই তোমাকে দেখার পর আমার সব কিছু ওলোট-পালোট হয়ে গেছে। আমি তোমাকে ভালোবেসেছি। আমাকে এখন তোমার করে নাও। কলিজার ধুক ধুক পুনরায় বেড়ে গেল আমার। বললাম, দেখো, আমরা উভয়েই বিবাহিত। তোমারও সন্তান আছে, আমারও সন্তান আছে। অপরদিকে স্ত্রীকে অসম্ভব ভালোবাসি। আমার পক্ষে অবৈধ কোনো কাজ করা সম্ভব নয়।

সে ফনা তুলে প্রশ্ন করে, এতো ঘুস নেও তাহলে কি করে?

বললাম, দুঃখিত ম্যাডাম, আমার পক্ষে ঘুস নেয়ার সুযোগ নেই। পিতা-মাতার মর্যাদা হলো আমার কাছে সবচেয়ে দামি।

মহিলাটি আমার পাশে শুয়ে পড়লো।

ভয়ে আমার কাঠ অবস্থা। এই বুঝি মান-ইজ্জত যায়! আমাকে জড়িয়ে ধরে সে কেদে ভেসে যেতে লাগলো।

তার পিতা-মাতা বা ভাই টের পেলে আমার বিপদ হবে বলায় সে ফনা তুলে বললো, চুপ থাকো, কিচ্ছু হবে না।

অনেক অনুনয়-বিনয় করে তাকে ফেরত পাঠাতে সক্ষম হলাম। আমকে প্রায়ই বাইরে থাকতে হয়। দুই, চার, ছয়, আট দিন পর্যন্ত বাইরে থাকতে হয়। শ্রান্ত-ক্লান্ত হয়ে ফিরে এসে মহিলাটির জেরার মুখে পড়তে হয়। স্নানান্তে আহার পর্ব সমাধা করে শুয়ে পড়তেই মহিলাটি ওপাশে শুয়ে পড়ে। আমার কাছে সব সময় লোকজন আসে। তারা কেউ দেখলে অসুবিধা হবে বলেও তাকে তাড়ানো যায় না।

পরদিন রাত দশটার পর এসে আমার বুকের ওপর শুয়ে পড়লো।

অসম্ভব এক পরীক্ষা দিয়ে চলেছি। মহিলাটিকে ভোগ-দখল করার কোনো সমস্যাই ছিল না অথচ সেটাই ছিল আমার সমস্যা। কান্নার সঙ্গে আমাকে কামড়ানো শুরু করতেই বললাম, তোমার স্বামীর স্বত্ব আমাকে দিতে পারো না। সেই পাপ করতে পারবো না।

কান্না ভুলে ফোস ফোস করতে করতে চলে গেল।

পরদিন অসম্ভব এক বিপদকে নিয়ে এলো আমার সামনে। রাত নয়টার পর এক তরুণীসহ আমার রুমে এলো। বললো, ওর নাম সাবেরা (নকল নাম) আমার বাল্য সখী। এখনো বিয়ে হয়নি। আমার স্বামীর স্বত্ব তোমাকে দিতে পারি না বলেছো। তাই ওকে এনেছি। আমার পরিবর্তে ওকে দিয়ে যাচ্ছি। ভয়ের কিছু নেই। সইকে অন্য কেউ না ভেবে আমাকেই পেয়েছো ভেবে নিও। বলার পর চলে গেল।

আমার বোধশক্তি এলোমেলো হয়ে যাচ্ছিল। সাবেরার সঙ্গে আলাপ শুরু করি। জানা গেল, তারা বেশ গরিব। পিতা না থাকায় ভাইদের সংসারে তাকে বোঝা রূপে থাকতে হচ্ছে। কোহিনূরের বহুবিধ সাহায্য নিতে হয় ওকে। তাই সই–এর দাবি পূরণ করতেই সে নির্দ্বিধায় চলে এসেছে। তার কাছে অন্য কিছুই বিচার্য নয়। সই–এর জন্য সব কিছুই সে বিনা দ্বিধায় করতে পারে।

আমি একজন মানুষ এবং সংবেদনশীলতা বেশ গভীরভাবেই আমার মধ্যে ক্রিয়া করে। দুই সই–এর সখ্যতার গভীরতা পরিমাপ করে আমাকে অভিভূতই হতে হলো। শ্রদ্ধাবনত হতে হলো। সাবেরাকে বেশ পছন্দও করলাম। কিন্তু আমার পক্ষে পরাগমন করা সম্ভব ছিল না। তাই বিনীত ক্ষমা প্রার্থনা করার পর পরাজিত সাবেরাকে বিদায় করতেই হলো।

সাতসকালে কোহিনূর এসে বললো, এতো তোমার অহংকার! আমাকে তুমি এভাবে অপমান করবে ভাবতেও পারিনি। আমার সই পরাজয়ের লজ্জায় কাদছে।

বললাম যে, এতো পরাজয় নয় ম্যাডাম। তোমার ভালোবাসা যে কতো বড় মাপের তা আমি ছাড়া আর কেউ পরিমাপ করতে সক্ষম হবে না। তোমাকে আমি স্যালিউট করছি।

তলব আসায় প্রাতঃরাশ পর্ব শেষ করে রওনা হই।

ফিরে আসি ষোল দিন পর। আমার কাজ ছিল চোরাচালানিদের উৎসকে খুজে বের করার পর আঘাত করা। আমাকে অসম্ভব সব ঝুকি নিয়ে কাজ করতে হতো। প্রচুর উৎকোচ সাধা হতো। আমি যে গরিব সেই গরিবই থেকে গিয়েছি। তাই আজ বিবেকের কোনো তাড়না আমার কোথাও নেই। ষোল দিন পর ফিরে এসে জানলাম যে, আমাকে বিমুক্ত করে দেয়ার জন্য ঢাকা থেকে তারবার্তা এসেছে।

আমি ফিরে যাবো শুনে কোহিনূরের উথাল–পাথাল শুরু হলো। রাতে এসে সে ঝাপিয়ে পড়লো আমার ওপর। এমন হলো যে, নিজের ওপর আস্থা না থাকলে হেরেই যেতাম।

চোখের জলে আমার বুক ভিজিয়ে দিল সে।

এক অসহায়, নিঃস্ব নারীর সকল আকুতি ঝরিয়ে সে আমাকে কাদিয়ে ছাড়লো। আমার বুকে শুয়ে থাকার আকুতিকে মেনে নিতে হলো।

চরম কষ্টের মধ্যে দুজনের রাত অতিক্রান্ত হলো।

এর চার দিন পর বিদায় নিলাম।

সই–এর পাশে সাবেরাও উপস্থিত ছিল, ছিল তার পিতা এবং ভাইও।

দেখেছিলাম এক নারীর অশ্রু। কারো চোখে এতো অশ্রু থাকে, চোখকে সয়লাব করে চিবুককে ভাসিয়ে দিতে পারে তেমনটা আমার দেখা ছিল না।

তাই আজও এক নারীর সেই অশ্রু আমার মানসপটে চিকচিক করে এবং ব্যথাতুর করতে থাকে।

টাংগাইল থেকে

প্রীতম

প্রমি

ছোট ভাইয়ের কাছ থেকে প্রীতমদার সেলুলার নাম্বার পেয়েছি বেশ কিছু দিন হলো। কিন্তু কখনোই ফোন করা হয়ে ওঠে না। বেশ কয়েক বছর আগে যোগাযোগ ছিল চিঠিতে প্রীতমদার সঙ্গে।

প্রীতমদা সম্পর্কে আমার কাজিন।

আমি ও আমার এক দিদি মিলে প্রায়ই বিভিন্ন মোবাইল নাম্বারে মিসকল দিয়ে বিরক্ত করতাম নাম্বারধারীদের। কেউ কেউ মিসকলের উত্তর দিতো। এদের মধ্যে যারা ছেলে তাদেরকে প্রায়ই বিরক্ত করি। ওরাও খুশি হয়। আমাদের দেখতে চায় সামনাসামনি। কিন্তু কখনো দেখা দিইনি।

ঠিক একইভাবে প্রীতমদাকে প্রতি ঘণ্টায় ঘণ্টায় মিসকল দিলেও কোনো উত্তর না পেয়ে একদিন নিজেই ফোনে তিন মিনিট চার সেকেন্ড কথা বললাম।

আমার পরিচয় পেয়ে দাদা ভীষণ খুশি। দাদা বিয়ে করেছেন কয়েক বছর হলো। একটি মেয়েও হয়েছে যার বয়স দুই বছর।

এরপর থেকে দাদা সময় পেলেই সেলুলারে ফোন করেন। আমাকে ভালোবাসার কথা বলেন। আমাকে যে ভালোবাসতেন তাও জানালেন। আরো বলেন, আমি এক ডাক্তার ছেলেকে পছন্দ করি বলে তিনি আর আমাকে বিয়ের জন্য বলেননি।

দাদার কথায় কি যেন একটা টান আছে। তিনি খুব আবেগ ভরা কণ্ঠে কথা বলতে পারেন। দাদা ঢাকায় চাকরি করেন। ফাজলামি করে বললাম, দাদা আমাকে যদি সত্যিই ভালোবাসেন তো দুই একদিনের মধ্যে আমাকে দেখতে রাজবাড়ি জেলা শহরে আমাদের বাসায় আসবেন।

প্রীতমদা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বললেন, চেষ্টা করবো।

আরো ন্যাকামো করে বললাম, আমার সঙ্গে দেখা না করলে আপনার সঙ্গে আর কোনোদিন কথা বলবো না।

পরের দিনই প্রীতমদা আমাদের বাসায় এসে হাজির।

দাদাকে নিয়ে শহরের প্রতিটি জায়গা ঘুরে বেড়ালাম, ছবি তুললাম। বাসায় ফিরে ছাদে উঠে দাদাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেতেই দাদা কেঁপে উঠলেন।

যেই আমাকে চুমু খেতে গেলেন অমনি আমি সরে এলাম।

প্রীতমদাকে হঠাৎই তুমি করে বলেছি। দাদা ভীষণ খুশি হলো তুমি সম্বোধনে। বললাম, ভালো একটা ছেলে দেখে আমাকে বিয়ে দিয়ে দাও। তবে ঢাকায় চাকরি করে এমন যেন হয় তাহলে তোমার কাছে থাকতে পারবো। বিয়ের পর একটি মাত্র সন্তান নেবো আর তা হলো মেয়ে।

দাদা বললেন, মেয়েটি না হয় আমিই বানিয়ে দেবো।

সে কি করে সম্ভব?

দাদা বললেন, পৃথিবীর সব সন্তানের আসল পরিচয় শুধু তার মা জানে। অর্থাৎ মা-ই বলতে পারবে সন্তানের পিতা কে? সে রকম আমিও না হয় তোমার সন্তানের পিতা হবো যদি তুমি রাজি থাকো।

আমিও রাজি হলাম।

দাদা আমার মেয়ের নাম রাখলেন মিতুল।

সন্ধ্যায়ই দাদা চলে গেলেন।

বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত ওনাকে সি-অফ করতে গেলাম। দাদাকে বোঝালাম, ডাক্তারকে নয়, ওনাকেই ভালোবাসি। দাদার *সুবর্ণ পরিবহন* ছেড়ে দেয়ার পর গুডবাই জানিয়ে বাসা ফিরলাম।

কিভাবে যেন দাদার মোহে কেটে গেল সারাটা রাত।

প্রতিদিনই দাদার সঙ্গে ফোনে কথা হয়।

এরই মধ্যে তিনি আমাকে একটি গ্রামীণ সেলুলার ফোন গিফট করলেন।

উপহার পেয়ে আমিও আমার ডাক্তার, রহিম ও নাফিকে ফোন করি প্রায় সময়ই। ওদেরকেও ভালোবাসার কথা বলি, বিয়ে করার আশ্বাস দিই।

এরপর একদিন দাদা আমার সঙ্গে আবার দেখা করতে এলেন। এবারও সেই পুরনো জায়গাগুলোতে বেড়াতে গেলাম। ছবি তুললাম। রিকশায় ঘুরে বেড়ালাম।

দাদা অনেক বেশি কিছু আশা করেছিলেন এবার আমার কাছে।

কিন্তু একটুও এগোতে দিইনি, বরং বলেছি, আপনি বিবাহিত, সন্তান আছে। যদিও আমি জানি দাদার দাম্পত্য জীবন সুখের নয়।

দাদা আর কোনো কথা বলেননি। আমাকে আদর করতে সাহস পাননি। বাসার গেটে আমাকে নামিয়ে দিয়ে চলে গেছেন।

ইদানীং দাদার সঙ্গে কথা বলা কমিয়ে দিয়েছি। দাদার সঙ্গে কথা বললে কেমন যেনো ঘোরের মধ্যে পড়ে যাই আমি। অন্য রকম এক ভালোলাগায় আমাকে আচ্ছন্ন করে। নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারি না। ওনাকে খুব বেশি অনুভব করি। বিশেষ কর দুপুর একটার দিকে দাদাকে ফোন না করে থাকতেই পারি না। অন্তত একটা মিসকল হলেও দিই। তাহলে কি বোকাদের মতো দাদাকে ভালোবেসে ফেললাম? নাকি ডাক্তার, নাফি, রহিমের মতো প্রীতমকেও এভয়েড করতে পারবো। মনে হয় পারবো না। কারণ আমি সত্যিই প্রীতমকে ভালোবেসে ফেলেছি।

যে আমি ভালোবাসা ভালোবাসা খেলা খেলতেই শুধু পছন্দ করি সেই আমি প্রীতমের জন্য এখন পাগল। সত্যিই প্রীতম, তোমার ভালোবাসার কাছে হেরে গেলাম। প্রীতম তোমাকে ভালোবাসি ভী–ষ–ণ। জানি না এর শেষ কোথায়।

ফরিদপুর থেকে

নারীর যোগ্যতা

– সুলতানা রাজিয়া

ডক্টর অফ ভেটেরেনারি মেডিসিনের আমার এক বান্ধবীর কথা আমার আজও মনে পড়লে ভীষণ কষ্ট পাই। ওর শেষ পর্যন্ত আর ডাক্তার হওয়া হলো না। কারণ একটাই, *পেলভিক বোন (Pelvic Bone)*। এই বোন–এর কারণে তার লেখাপড়ার সমাপ্তি ঘটেছে। মৃত্যু হয়েছে এক প্রতিভাময় সম্ভাবনার।

স্তন্যপায়ী প্রাণী, বিশেষ করে মানব দেহের কোমরের নিম্নাংশে আবৃতকারী হাড় সমষ্টির কাঠামোকে *পেলভিস* বলে। আর এ পেলভিস–এর সামনের নিম্নাংশ যেখানে যৌনাঙ্গ অবস্থান করে সেখানেই *পিউবিক* অথবা *পেলভিক বোন*–এর উপস্থিতি। মেয়েদের এ পেলভিকের সহজ–সুলভ সঞ্চারণের কারণেই আমাদের সুস্থভাবে পৃথিবীতে আসা। মেয়েরা যখন গর্ভবতী হয় তখন প্রকৃতপক্ষে Relaxin এবং Progesterone নামক বিশেষ ধরনের Pregnancy Hormone দেহ থেকে নিঃসৃত হয়। আর এ হরোমন তখন গর্ভবতী নারী দেহের লিগামেন্টগুলোকে প্রসারিত করতে সাহায্য করে, বিশেষ করে সন্তান প্রসবের সময় যৌনাঙ্গের নিকটস্থ এ পেলভিক বোনকে ঠিক প্রয়োজন মতো ফাক হতে সাহায্য করে। এবং তখনই আমাদের মতো মানুষ পৃথিবীর মুখ দেখতে পায়।

যেটা বলছিলাম, বান্ধবীর কথা। তখন সে তার বিভাগের এক শিক্ষকের লোলুপ দৃষ্টিতে পড়েছিল। ইচ্ছা করলেই একজন ছাত্রী এ শিক্ষকের বলয় থেকে মুক্তি পায় না যদি তার কুদৃষ্টি কোনো ছাত্রীর দিকে একবার পড়ে। সে কারণে অবলা মেয়েদের অবলাই থাকতে হয় দেশের একটি টেকনিকাল ইউনিভার্সিটির মতো এ উচ্চ বিদ্যাপিঠেও।

হয় সতীত্ব হারাও, না হলে ডিগ্রি নাও।

এসব মেয়েদের ছেলে বন্ধুদেরও কিছু করার থাকে না তখন। কেননা ছাত্র–শিক্ষক কোনো কোনো ক্ষেত্রে একই রাজনৈতিক সংগঠনের ছায়াতলে আবদ্ধ। ফলে ব্যক্তির চেয়ে দল বড়।

একই বিষয়ে বার বার ফেল করাতে বিষিয়ে ওঠে বান্ধবীটি।

হঠাৎ ওই স্যার একদিন তাকে ডেকে বসেন।

সে যায় স্যারের চেম্বারে তার অন্য এক বান্ধবীকে নিয়ে। কেন ফেল করলো, কি কি কারণ ছিল ইত্যাদি।

স্যার তাকে বোঝান, এটা–ওটা ব্যাখ্যা করে।

দ্বিতীয় দিনে একা যায় সে।

তাকে অনেক শিখিয়ে দেয় স্যার।

খুশি হয় আমার বান্ধবী।

তৃতীয় দিনে এনিমেল এনাটমি বিষয়ে শেখানোর এক পর্যায়ে স্যার তাকে প্রশ্ন করেন, *পেলভিক বোন তোমার নিজের শরীরে দেখাও!*

টকটকে লাল হয়ে যায় বান্ধবীটির মুখখানি। সালাম দিয়ে নীরবে বের হয়ে আসে সে। তার প্রেমিককে লজ্জায় বলে না।

আবার পরীক্ষা দেয়, পাস করে না। সব ঘটনা এবার সে বলে অন্য শিক্ষকদের। কোনোই লাভ হয় না। কারণ বাংলাদেশে সবারই সফল সমিতি আছে, সংগঠন আছে। নেই শুধু নারীদের। নারীদের চাই যোগ্যতা।

পরে আমার বান্ধবী আর কোনোদিনই পাস করতে পারেনি। গরুর ডাক্তারও হতে পারেনি সে।

দেখতে খুব সুন্দরী না হলেও গলার পেছনে, চোয়ালে ও আপার–লিপে কিছু বিশেষ লোম থাকাতে অনেক ছেলে বন্ধু বা সহপাঠীদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে আমার প্রতি। আর এ বিশেষ লোমের কারণেই প্রায় ধরাশায়ী হতে যাচ্ছিলাম আমারই এক চল্লিশোর্ধ শিক্ষকের হাতে, তার রসনার ফাদে আটকাতে। আনটাচড এবং বিশেষ করে শরীরে লোমযুক্ত মেয়ে বেচারার খুবই পছন্দের ছিল।

আমি তখন একই ইউনিভার্সিটির অন্য অনুষদের কোনো এক ইয়ারের একজন ছাত্রী। এ ইয়ারে আমাদের ফ্যাকাল্টির Genetics and Breeding-এর class নেয়া হতো। সুযোগ বুঝে ওই স্যার ওই সময় টোপ ফেলতেন মেয়েদের মধ্যে তার পছন্দের ছাত্রীকে ভালো নাম্বার অথবা পাসের আশা দিয়ে লুফে নিতে। সরলা, সবলা, অবলা এবং যোগ্য মেয়েই এ নারী–প্রেমিকের ক্ষিধে মেটাতো। না হলে বার বার ফেল করে চিরবিদায় হতো। অথবা কোনো মামা বা দলীয় নেতার সাহায্য নিয়ে কোনো মেয়েকে সফল হয়ে অতি কষ্টে বেরিয়ে আসতে হতো নারী পিপাসু শিক্ষিত জানোয়ারের হাত থেকে! কারণ এ জাতীয় ব্যক্তিই কোনো না কোনো রাজনৈতিক দলের রাথে সরাসরি যুক্ত থাকে।

একদিন তার প্র্যাকটিকাল ক্লাসে আমার ক্লাসমেটদের সঙ্গে ছিলাম। হঠাৎ স্যারের একটি প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলাম না। প্রশ্নটি যদিও বিষয় ভিত্তিক ছিল।

ক্লাস শেষে স্যার সব ছাত্রছাত্রীকে চলে যেতে বলেন শুধু আমি ছাড়া। সবাই চলে যায়। যদিও সবাই এই স্যারের চরিত্র সম্পর্কে জানে, আমিও জানি তবুও থাকতে হলো আমাকে।

এক সময় স্যার তার সঙ্গে তার চেম্বারে যেতে বলেন।

এনিমেল হাজবেন্ড্রির প্র্যাকটিকাল ক্লাসের বড় একটি ভবনের মধ্যে স্যারের চেম্বারটি ছিল অনেকগুলো হলরুম পার হয়ে অদূরে একটি নির্জন কুঠুরি।

ভয়ে আমার শরীরে কাপুনি উঠছে, মুখ দিয়ে কোনো কথা বের হচ্ছে না।

চেম্বারে নেয়ার পর স্যার আমাকে ওনার সামনের চেয়ারে বসতে বলেন। বেয়ারাকে ডেকে বলেন, *তুমি আমার জন্য সিগারেট নিয়ে এসো।*

ব্যস, সবই নীরব! আমার আশপাশে এনিমেল ছাড়া মানুষ বলতে কেউ রইলো না!

আমাকে ভয় পাচ্ছো? ভয়ের কিছু নেই! স্যার আমাকে সান্ত্বনার সুরে বলেন, *সিমবায়োসিস* বোঝো?

বু–বুঝি। কিছুক্ষণ থেমে উত্তর দিলাম।

শোনো মেয়ে, এমন কাজ আমরা করবো যাতে তুমি উপকৃত হও আর আমিও উপকৃত হই। স্যারের প্রস্তাব।

ইন্নানিল্লাহ! আমি মনে মনে উচ্চারণ করলাম।

এই মেয়ে, কিছু বলছো না যে?

স্যারের প্রশ্নের উত্তরে না গিয়ে আমি *লা ইলাহা ইল্লা আন্তা সুবহানাকা ...* পড়ছি বার বার। আর সময় ক্ষেপণ করছি।

স্যার, সি–গা–রেট। দরজায় টোকা দিয়ে বেয়ারার অপেক্ষা।

ওকে। তুমি আমার বাসায় আসবে। শহরে আমার যে মুরগির ফার্মটি আছে ওখানে তোমার পার্টটাইম কিছু কাজের ব্যবস্থা করে দেবো। তাতে তোমার ব্যবহারিক জ্ঞান অনেক বৃদ্ধি পাবে, তুমি ভালো রেজাল্ট করতে পারবে। নিশ্চয়ই তুমি তোমার ভালো চাও, তাই না? স্যারের সৎ উপদেশ। ওকে। আজ তাহলে এসো।

মাথা নিচু অবস্থাতেই সরে এলাম। বাসায় এসে আমার শিক্ষক বাবাকে বললাম, মাকেও বললাম ঘটনাটি।

মা বললেন, আর ওমুখো হওয়ার দরকার নেই। বাবা তার এক বন্ধু যিনি ওই একই ইউনিভার্সিটির অন্য ফ্যাকাল্টির একজন শিক্ষক তাকে দিয়ে আমার শিক্ষককে বোঝালেন। বলালেন, *মেয়েটি আপনাকে দেখে ভয় পায় কেন?*

কিন্তু তাতে কোনো লাভ হলো না।

একদিন স্যারের রাজনৈতিক দলের এক টেরর ছাত্র নেতাকে অনুরোধ করলেন আমাকে ভয় দেখাতে এবং আমি যেন স্যার যা যা করতে বলে তা করি।

শুনে নেতাটি বলে, *ওরে বাপরে! আমারে কাইটটা ফালাইবো ও যদি শোনে এ কথা।* ও হলো আর এক ছাত্রনেতা যে আমার একজন ভালো শ্রেণীর বন্ধু ছিল, আমাকে ভালোবাসতো সে। শেষ পর্যন্ত, আমার সে ভালো বন্ধুটির অজুহাতে আমাকে ফেল করানো তো দূরের কথা, ভালো নাম্বার নিয়ে বের হয়ে আসতে বাধ্য করে ওই শিক্ষকটি।

দেরি হলেও বুঝতে পারলাম ভালো রেজাল্ট অথবা পাস করতে নারীর কি কি যোগ্যতা থাকা দরকার। পরে আরো জেনেছি, প্র্যাকটিকাল ক্লাসের অপরিহার্যতার সুযোগ নিয়ে এ স্যারটি বহু মেয়েকে ব্যবহার করেছেন এবং পরে ভালো পাত্র দেখে এসব মেয়েদেরকে বিয়েও দিয়েছেন। তাদের জীবন সঙ্গীদেরকে বুঝতে দেয়া হয়নি সঙ্গিনীরা কি বেচে কি কিনেছে।

আজ আট নয় বছর পর আবার সেই সব বেচারা শিক্ষকদের কথা আমার মনে পড়ছে, মনে পড়ছে তাদের হতভাগিনী স্ত্রীদের কথা। এসব হতভাগিনীর কি কোনোই যোগ্যতা নেই তাদের স্বামীদেরকে কোনোভাবেই এ পথ থেকে সরিয়ে নেয়ার? কোনো পথই কি নেই ওদেরকে ভালো করার, মানুষ করার?

আছে!

মনে পড়ে সেই ঘটনাটি, *এক লুচ্চা (বহুগামী পুরুষ) প্রায় প্রতি রাতেই খালের অপর পাড়ে এক রমণীর ঘরে যেত। হঠাৎ তার পায়ে পচন ধরে শয্যাশায়ী হলে আর যেতে পারে না। তার প্রেমময়ী স্ত্রী এ পঙ্গু স্বামীকে কোলে করে প্রতি রাতে খাল পার করে দিয়ে আসতো। হঠাৎ একদিন স্বামীটি আর যায় না। স্ত্রী দিয়ে আসতে চাইলেও না। একদিন পা ভালো হয়, কান্নায় জড়িয়ে ধরে স্ত্রীর কাছে ক্ষমা চায়। বলে, আর সে কখনো ওঘরে যাবে না তার স্ত্রীকে ফেলে।*

তাই আসুন, আমরা নারীরা, আমাদেরকে আগে রক্ষা করি। তারপর অন্য নারীদেরকেও বাচাতে সাহায্য করি। তার দুর্দিনে আমরা তার ভালো বন্ধু হই, মনের কথা শুনি। সারা দিনের কর্মব্যস্ততার পর বিশেষ রাতগুলোতে নিজেকে সুন্দর করে উপস্থাপন করি, ভালোবাসি তাকে। নিজের সততা, নিষ্ঠা, একাগ্রতা, পবিত্রতা এবং ভালোবাসা দিয়ে আসুন নিজেকে যোগ্য করে তুলি, একটি ভালো ও সুস্থ সমাজ গড়ি।

নারা উইমেনস ইউনিভার্সিটি, জাপান থেকে

raeedahmed@yahoo.com

ভাবনা

– নীলা ফাল্গুনী

বার বার *ভালোবাসি ভালোবাসি ভালোবাসি* বলে আমার ভালোবাসাকে অর্থ ছাড়া করাটা আমার পছন্দ না। আমার ভালোবাসা অনেকটা অন্য রকম। আমি ভালোবাসি আমার মধ্যে থেকে। এর মানে এই না, আমি ভালোবাসি না।

আমি তাকে মিস করি। একা মুহূর্তগুলোতে অনুভব করি। ফোন বাজলে আমার মনে হয় ফোনটা তার। রাস্তায় বের হলে মনে হয় এই বোধহয় দেখা হয়ে যাবে। দেখা হলে কি করবো, ভাবতে থাকি। দূরে থাকলে সব সময় মনে হয় যদি সঙ্গে থাকতো। এটাই তো ভালোবাসা।

আমার ভালোবাসা স্পর্শ ছাড়া ভালোবাসা। সামনে গেলে প্রকাশ করতে পারি না আমার ভেতরে থাকা ভালোবাসাকে, আমার অনুভবের অনুভূতিগুলোকে। তার কি উচিত না আমার চুপ করে থাকা অনুভবগুলোকে বুঝতে পারা? সে তো বোধহয় বোঝে না। সে ভাবে আমি তাকে ভালোবাসি না। তাতে আমার কি?

ঠিকানা বিহীন

মিল

– মোহাম্মদ হযরত আলী

ছোট্ট একটা ভাপা পিঠার দাম পাচ টাকা! এ যেন বাংলাদেশ নয়, কাতারের রাজধানী দোহায় বসবাস করছি আমরা।

আমার মন্তব্যে পিঠা বিক্রেতা কিশোরী লোপা কিছুটা আশাহত হলো। তারপর আত্মপক্ষ সমর্থন করে বললো, শুধু কি পিঠার দামই বেশি? কোন জিনিসের দাম কম দোহারে? চাল, ডাল, মাছ, মাংস, ফল–মূল, কসমেটিকস, গার্মেন্টস, ক্রোকারি, ইলেকট্রনিক্স, হার্ডওয়্যার সব পণ্যই রাজধানী ঢাকার সঙ্গে চ্যাম্পিয়ন দৌড়ে অগ্রগামী।

কথার ফাকে ফাকে আমাকে সাহেব সম্বোধন করে লোপা আরো বললো, একটা পিঠা বিক্রি করে আর কতো পয়সা বেশি নেয়া যায়? চার আনা কি আট আনা। এটাই যদি আপনার কাছে বেশি মনে হয় তাহলে তো বলবো, আপনি বোধহয় কখনো দোহার থেকে ঢাকাগামী কোনো বাসেই চড়বেন না। কারণ দোহার থেকে গুলিস্তানের জিরো পয়েন্টের দূরত্ব হচ্ছে আটান্ন কিলোমিটার। ভাড়া দিতে হয় পঞ্চাশ টাকা! দোহারের এই ভাড়া দেশের যে কোনো রুটের বাস ভাড়ার চেয়ে বেশি ছাড়া কম নয়।

গুলিস্তানের জিরো পয়েন্ট থেকে কিশোরগঞ্জের কাটিয়াদি উপজেলার দূরত্ব একশ বিশ কিলোমিটার। ভাড়া চল্লিশ টাকা। নরসিংদীর পলাশের দূরত্ব আটান্ন কিলোমিটার। ভাড়া ত্রিশ টাকা। কটিয়াদি, পলাশ, ধামরাইয়ের তুলনায় দোহারের বাস কর্তৃপক্ষ যাত্রীদের কাছ থেকে শতকরা যথাক্রমে এক দশমিক আটান্ন, ছিষট্টি, তেষট্টি ভাগ ভাড়া বেশি নিচ্ছে। অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে অতিরিক্ত ভাড়া আদায়ের বিরুদ্ধে কথা বলার যেনো কেউই নেই। এটা অত্যন্ত দুঃখজনক। আরো দুঃখজনক এই জন্য যে, দোহার থেকে ঢাকা জেলার ভেতর দিয়ে গুলিস্তানে সরাসরি পৌছানোর কোনো রাস্তা নেই।

দোহারের বাস এখন মুন্সীগঞ্জ জেলার শ্রীনগর উপজেলা হয়ে কেরানীগঞ্জের দ্বিতীয় ধলেশ্বরী বৃজ পার হয়ে নয়াবাজার দিয়ে গুলিস্তানে পৌছে। অথচ নবাবগঞ্জ উপজেলার তুলসীখালী ও মরিচা ফেরিঘাট বরাবর নির্মিত বৃজ দুটির কাজ যদি অতি দ্রুত সম্পন্ন হতো আর দোহারের বাস যদি এই রাস্তা দিয়ে সরাসরি ঢাকা যেতে পারতো তবে দোহার থেকে ঢাকার দূরত্ব হতো পয়তাল্লিশ কিলোমিটার। অথবা একটি রাস্তা যদি মুন্সীগঞ্জ

জেলার সিরাজদ্দিখান উপজেলার আড়িয়াল বিল ঘেষে কেরানীগঞ্জ হয়ে ঢাকা গিয়ে মিশতো তাহলে দোহার থেকে গুলিস্তানের দূরত্ব হতো মাত্র বত্রিশ কিলোমিটার। এই রাস্তা দুটি দিয়ে যদি দোহারের বাস ঢাকা যেতে পারতো তাহলে বর্তমান ভাড়ার অনুপাতে দোহার থেকে ঢাকা যাওয়ার ভাড়া লাগতো যথাক্রমে উনচল্লিশ এবং সাতাশ টাকা! ফলে দোহারবাসীর টাকা, সময় ও দুর্ভোগ সবই কমে যেতো।

একজন পিঠা বিক্রেতা কিশোরীর মুখে দোহারের বাসের বর্ধিত ভাড়া এবং ঢাকা জেলার ভেতর দিয়ে দোহার থেকে ঢাকায় যাওয়ার সরাসরি রাস্তা সংক্রান্ত সমস্যার কথা এতো বিশদভাবে জানতে পেরে কিছুটা অবাকই হলাম। আরো অবাক হলাম যখন পাশে পিঠা তৈরিতে ব্যস্ত লোপার দাদির মুখে শুনলাম, লোপা এবার এসএসসি পরীক্ষা দেবে এবং সে ক্লাস ফাইভ ও এইটে ট্যালেন্টপুলে বৃত্তি পেয়েছে। তার দাদি আরো বললো, লোপা পড়াশোনায় খুবই সিরিয়াস। এবং একটি কথা নাকি সে প্রায়ই বলে থাকে। জানো দাদি, মানুষ জন্মগ্রহণ করলেই সে মানুষ হয়ে যায় না। মানুষ হতে হলে তাকে পড়াশোনা করে দ্বিতীয়বার জন্মগ্রহণ করতে হয়। আর পড়াশোনা করলে মানুষের মনের জানালাগুলো ভেতর থেকে একটা একটা করে খুলে যায়। ফলে মানুষের ভেতরটা আলোকিত হয়। এবং সে আলোতে মানুষ, ভালো-মন্দ, সত্য-মিথ্যা, আলো ও অন্ধকারের পার্থক্য বুঝতে পারে।

দাদির কথার ফাকে লোপা দুটি পিঠা একটি কাগজে মুড়ে আমাকে দিয়ে বললো, জানেন সাহেব দুটো পিঠায় হয়তো আপনি আট আনা বেশি দিচ্ছেন। কিন্তু এই আট আনার বিনিময়ে আপনি পিঠার সঙ্গে পাচ্ছে আমার মা ও দাদির স্নেহ মাখা নিখাদ ভালোবাসা। আপনিই বলুন, এই দুর্মূল্যের বাজারে আট আনা দিয়ে কি ভালোবাসা পাওয়া সম্ভব?

সময় স্বল্পতার কারণে লোপার সঙ্গে বিতর্কে জড়ালাম না। পিঠার দাম দিয়ে বাসায় ফিরলাম।

অফিসে যাওয়ার আগে পিঠা খেলাম। পিঠা খেতে খেতে আমার মায়ের কথা মনে পড়লো। আমার মায়ের তৈরি ভাপা পিঠার স্বাদের সঙ্গে লোপার দাদির তৈরি ভাপা পিঠার স্বাদের কোথায় যেন একটা মিল খুজে পেলাম।

দোহার, ঢাকা থেকে

দুই মেরু

– মুক্তা রহমান

১৯৯৮ সালের মাঝামাঝি আমেরিকাসহ সারা বিশ্বে বিল ক্লিনটন এবং মনিকা-র সম্পর্ক নিয়ে তোলপাড় চলছে। এমনি এক উত্তেজনাকর সময়ে আমেরিকার টেক্সাস অঙ্গরাজ্যের এক ইউনিভার্সিটিতে গেলাম এক বছরের একটি ফেলোশিপ নিয়ে। তখন পরিচিত হয়েছি অসংখ্য মানুষ, বিশেষ করে অনেক দেশের দম্পতি, প্রেমিক-প্রেমিকা এবং কপোত-কপোতীদের সঙ্গে। এর মধ্যে দুটি দেশের দম্পতির আচরণ, ভালোবাসা আর বিপরীতধর্মী ফলাফল থেকে বহুদিন ভেবেছি *সখী ভালবাসা কারে কয়?*

দুটি দম্পতির গল্প দিয়ে আপনাদের মাঝেও একই প্রশ্নের উদ্রেক ঘটাতে পারবো বলে আমার বিশ্বাস। তাহলে শুরু করা যাক সউদি এক দম্পতির কথা দিয়ে।

সউদি বন্ধুটি মাত্র দুই বছর আগে বিয়ে করেছে। গত ছয় মাস ধরে স্ত্রীসহ এক বাসা ভাড়া নিয়ে বসবাস করছে। গায়ে রাজ-রক্তের ছিটে-ফোটা আছে তাই অঢেল টাকা খরচ করার ক্ষমতা। স্বামীপ্রবর রুটিন মাফিক সকাল আটটায় স্ত্রীর সাজিয়ে রাখা নাশতা গোগ্রাসে গিলে দরজায় ঝুলিয়ে দেয় ঢাউস সাইজের একটা তালা। কাধে একটা ব্যাগ ভর্তি ডলার নিয়ে বেরিয়ে যায়।

জানালায় দাড়িয়ে স্ত্রী সজল চোখে তাকিয়ে দেখে গাড়ির ধোয়া যেখানে আকাশের দিকে ধেয়ে যায়। স্বামীর হাতের ইশারায় পর্দা টেনে শরীরটা এলিয়ে দেয় মখমল বিছানায়।

ক্লাস, সেমিনার, হই হুল্লোড়, আড্ডা, ভলি খেলা, ক্যাসিনোগুলোতে ঢু মেরে ইংরেজি শিখতে যায় *লং হেয়ার ডিকশনারি* বলে খ্যাত এক মোহময়ী বান্ধবীর ঘরে।

সুখের ঢেকুর তুলে মধ্যরাতে স্বামী যখন ঘরে ফেরে, অপেক্ষায় প্রহর গুণে গুণে স্ত্রী তখন ঘুমে ঢুলু ঢুলু, নির্জীব। শুক্রবার দিনটি হলো ব্যতিক্রম। ওই দিন দুপুর পর্যন্ত স্বামী ঘুমিয়ে কাটায়। দুপুরে জুমার নামাজ পড়তে স্ত্রীসহ স্থানীয় এক মসজিদে হাজির হয়।

স্ত্রী যেন এক মুক্ত বিহঙ্গ। অন্য মহিলা মুসল্লিদের সঙ্গে কথা শেষ হতে চায় না। বেশির ভাগ কথাই কার স্বামী কি কেনাকাটা করেছে, কবে দেশে ফিরবে, কোন আত্মীয় কি কি ভালো বা খারাপ কাজ করছে এসব।

স্বামী গাড়িতে বসে হর্ন বাজাতে থাকলে অনিচ্ছুক স্ত্রী গাড়িতে উঠে আসে।

স্বামীটি আজ স্ত্রীর বায়না রক্ষায় অত্যন্ত উদার। দামি রেস্টুরেন্টে বৌকে নিয়ে খাওয়া দাওয়া করে, বিলাসবহুল মার্কেট ঘুরে কাপড় গয়না আর সেন্ট কিনে দিতে কোনো কার্পণ্য করে না।

আনন্দে স্ত্রীর চোখে আনন্দ অশ্রু চিক চিক করে।

শনিবার থেকে শুরু হয় আবার বন্দী জীবন, অসহায় একাকীত্ব।

কথায় কথায় সউদি বন্ধুটিকে একদিন জিজ্ঞাসা করলাম, তোমার বৌ বাসায় সময় কাটায় কেমন করে?

সে মুচকি হেসে উত্তর দিল, আমার ধ্যান করে।

তুমি যে, সারা দিন ঘরে ফেরো না, এমনকি টেলিফোন করে খবর পর্যন্ত নেও না, ভাবীজি তোমাকে কি কিছুই বলে না?

সে হো হো করে হেসে উত্তর দিল, বৌ তো আমার চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলার সাহসও রাখে না। সে কি বলবে?

আমিও হেসে জিজ্ঞাসা করি, এটা কি ভালোবাসার সম্পর্ক?

সউদি বন্ধুটি একটু রেগে বললো, ভালোবাসা মানে মেয়েদের বেলেল্লাপনা হতে পারে না। আমার স্ত্রী শুধু আমাকেই জানে, আমাকে ছাড়া অন্য কিছু সে কল্পনাও করার সাহস রাখে না।

একদিন অন্য এক মহিলার মাধ্যমে স্ত্রীটির কাছে জানতে চাইলাম তিনি সময় কাটান কি করে।

কোরআন, হাদিস পড়ি, ভিসিডি-তে ইরানি সিনেমা দেখি, দেশে চিঠি লিখি, কথা বলি।

স্বামীকে কেমন পছন্দ করেন প্রশ্নের উত্তরে জবাব এলো, স্বামীর কোলে মৃত্যু কামনা করি আর ওকে ছাড়া বেহেশতে ঢুকবো না এই কসম করেছি।

দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলি, আমেরিকার বুকেও সউদি বালার প্রাণময়ী ভালোবাসা বেহেশতের নিয়ামতই বটে।

এবার বলবো আমেরিকান বন্ধু জ্যাক ও তার প্রেমিকা স্ত্রী লিয়ানার কথা। দুজন পাশাপাশি দুই শহরে চাকরি করেন। তবে প্রতি উইকএন্ড একত্রে সময় কাটানো অবশ্যম্ভাবী। প্রায় প্রতিদিনই থাকে কোনো না কোনো উপলক্ষে ছোটখাটো পার্টি। সান্ধ্য খাবারের পর নাচ, গান, গিফট দেয়া-নেয়া এসব ওদের নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার।

এই দম্পতিটিকে কয়েক মাস দেখে মনে হলো একে অপরকে জীবনের চেয়েও বেশি ভালোবাসে। কথায় কথায় *আই লাভ ইউ* বলে যে ভাবে জড়াজড়ি ও কিস করতে থাকে তাতে অন্য কিছু মনে আসতেই পারে না। আশপাশের সাগর, পাহাড়, বন, জঙ্গল দুজনে চষে বেড়িয়েছে আর ভালোবাসা নামের সোনার হরিণকে ধরতে চেয়েছে।

ওদের সম্পর্ক কেমন এ প্রশ্ন করতে আমি যখন দ্বিধান্বিত এমনি এক বিষণ্ন দিনে স্বামীর জন্মদিন উপলক্ষে স্ত্রী সকলকে পার্টিতে নিমন্ত্রণ করলো।

স্বামীর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলো।

দামি গিফট দিয়ে একটি ঘোষণা করলো, আমি আমার সহকর্মী জেসি–কে ভালোবেসে ফেলেছি। তাই জ্যাককে বিদায় জানাতে এই পার্টির আয়োজন। জ্যাক আমাদের নতুন সম্পর্ক মেনে নিয়েছে। আমরা ভালো বন্ধু থাকবো। ওকে হাজারো ধন্যবাদ।

লিয়ানার নতুন জীবনকে স্বাগত জানালো জ্যাক। সুন্দর ভবিষ্যৎ কামনা করলো। তারপর পার্টি থেকে বিদায় নিল।

কিছুক্ষণের মধ্যে নতুন বন্ধুকে নিয়ে লিয়ানা ডান্স পার্টিতে মেতে উঠলো।

মন খারাপ করে রুমে ফিরে এলাম। অন্য এক বন্ধুকে মন খারাপ হয়েছে বলতেই আমাকে সান্ত্বনা দিল, যে দেশের হোটেল রেস্টুরেন্টে ছয় বছরের দম্পতিদের জন্য হাফ ফ্রি এবং বারো বছরের দম্পতিদের জন্য ফুল ফ্রি সে দেশে বিয়ে ভেঙে গেছে বলে মন খারাপ করা হাস্যকর।

কয়েকদিন পর জ্যাককে সমবেদনা জানাতে ওর রুমে গিয়ে দেখি আরেক রূপসীকে জড়িয়ে বলছে, *আই লাভ ইউ*।

কোনোভাবেই হিসাব মেলাতে পারছিলাম না, এ একই দেশে ক্লিনটন আর মনিকাকে নিয়ে এতো হই চই কেন?

তবে হ্যা, জ্যাকের নতুন বান্ধবীর পরিচয় জানেন কি? সে আমার সউদি বন্ধুটির লং হেয়ার ডিকশনারি!

শান্তিনগর, ঢাকা থেকে